একক ৬৫ ❑ দক্ষিণ-পূর্ব উপমহাদেশে পর্তুগীজ ও ওলন্দাজ শক্তির ঔপনিবেশিক বিস্তার

গঠন

৬৫.০ উদ্দেশ্য

৬৫.১ প্রস্তাবনা

৬৫.২ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া উপমহাদেশ—একটি পরিচিতি

  ৬৫.২.১ উপমহাদেশ সম্পর্কে পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গি

  ৬৫.২.২ সংস্কৃতি ও সমাজ

৬৫.৩ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় পর্তুগীজ শক্তির আবির্ভাব

  ৬৫.৩.১ পর্তুগীজদের বাণিজ্যিক কার্যকলাপ

  ৬৫.৩.২ মিশনারীদের প্রয়াস

  ৬৫.৩.৩ পর্তুগীজদের বিরুদ্ধে দ্বীপবাসীদের প্রতিক্রিয়া

৬৫.৪ ওলন্দাজ ঔপনিবেশিক শক্তির বিস্তার

  ৬৫.৪.১ ইন্দোনেশিয়াতে ডাচ কর্তৃত্ব স্থাপন

  ৬৫.৪.২. ডাচ কর্তৃত্ব স্থাপনে V.O.C’-র ভূমিকা

৬৫.৫ ডাচ বাণিজিক সংগঠন

৬৫.৬ ডাচ বাণিজ্যিক নিয়ন্ত্রণ ও তার প্রকৃতি

  ৬৫.৬.১ বাণিজ্যিক নিয়ন্ত্রণের ফলশ্রুতি

  ৬৫.৬.২ স্থানীয় জনজীবনের উপর প্রভাব

৬৫.৭ ইন্দোনেশিয়ার অর্থনীতিতে ডাচ বাণিজ্যের প্রভাব

৬৫.৮ সারাংশ

৬৫.৯ অনুশীলনী

৬৫.১০ গ্রন্থপঞ্জী

৬৫.০ উদ্দেশ্য

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয় উপমহাদেশ পশ্চিমী ঔপনিবেশিকতাবাদের বৈশিষ্ট্যগুলি বর্তমান এককটিতে আলোচনা করা হয়েছে। এই এককটি পাঠ করলে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি আপনারা জানতে পারবেন—

- দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার পর্তুগীজ ও ডাচ উপনিবেশবাদ।
- উপনিবেশবাদ এই উপমহাদেশে কী পরিবর্তন নিয়ে এলো।
- এই পরিবর্তনে দ্বীপবাসীরা কতটা উপকৃত হলেন।
- এই অঞ্চলগুলি কেন দীর্ঘদিন ধরে পশ্চিমী শাসনের আওতায় রইল।
- এখানকার কৃষি, সমাজ, অর্থনীতি ও রাজনীতির উপর ঔপনিবেশিক শাসনের প্রভাব।

৬৫.১ প্রস্তাবনা

এই এককটিতে আলোচিত হল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয় উপমহাদেশের অবস্থিতি। এই অঞ্চলের সাংস্কৃতিক গুরুত্ব, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অভিঘাত সত্ত্বেও এখানকার নিজস্বতা কিভাবে বজায় রইল তা স্বল্প পরিসরে আপনাদের কাছে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

এরপর আলোচনা করা হয়েছে এখানকার পশ্চিমী শক্তির আগমনের ফলে পরিবর্তনগুলি। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য পশ্চিমের অভিযান দুটি পর্যায়ে সম্পন্ন হয়েছিল প্রথমত, রাজতান্ত্রিক উৎসাহে দ্বিতীয়ত বাণিজ্যিক কোম্পানিগুলির আগ্রহে। দুটি ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য কিন্তু একটিই—অর্থনৈতিক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা যার পশ্চাতে ছিল রাজনৈতিক অনুমোদন।

রাজতান্ত্রিক উৎসাহে আবির্ভূত হল পতুর্গীজরা এবং বাণিজ্য কোম্পানীর মাধ্যমে উপস্থিত হল ডাচ বা ওলন্দাজরা।

প্রকৃতপক্ষে ভারত মহাসাগরের উপর অবস্থিত এক বিশাল দ্বীপপুঞ্জ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া নামে পরিচিত। এই বিশাল দ্বীপপুঞ্জটির রয়েছে এক সমৃদ্ধ অতীত। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সমৃদ্ধ অতীত এবং ইউরোপীয় আগমনের সময়কালটি আধুনিক গবেষক ও ঐতিহাসিকদের আরো বিস্তৃত অনুসন্ধানের জন্য এক উল্লেখযোগ্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছে। এখানে আলোচনা করা হয়েছে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে উপনিবেশবাদের ইতিহাস এবং নির্দিষ্ট করা হয়েছে সেইসব বিদেশী শক্তিগুলিকে যারা এখানে ঔপনিবেশিকতার সূচনা করেছিল।

৬৫.২ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া উপমহাদেশ একটি—পরিচিতি

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভারত মহাসাগরের উপর অবস্থিত এক বিশাল দ্বীপপুঞ্জ। যে দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে আছে বর্মা, থাইল্যান্ড, লাওস, কম্বোডিয়া, ভিয়েতনাম, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপিন্স। এই দ্বীপপুঞ্জ বিস্তৃত রয়েছে ৩৫° অক্ষাংশে এবং ৫০° দ্রাঘিমাংশে। এই বিশাল দ্বীপপুঞ্জ প্রাচীনকাল থেকেই ভারত, চীন, ইসলাম জগত ও পশ্চিমী দুনিয়ার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার পূর্বদিকে চীন ও পশ্চিম দিকে ভারত। এই বিশাল দ্বীপপুঞ্জ কখনোও বা বিস্তৃত ভারত (Further India) নামেও অভিহিত হয়েছে। যদি কল্পনা করা যায় যে ভারত উপমহাদেশ পূর্বদিকে আরো প্রসারিত হয়ে গেছে তাহলে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াকে বিস্তৃত বা প্রসারিত ভারত (Further India) বলে মনে করা যেতেই পারে।

৬৫.২.১ উপমহাদেশ সম্পর্কে পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গি

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কাল থেকে অর্থাৎ ১৯৪০-এর দশক থেকে এখানে সামরিক প্রয়োজনে গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি গৃহীত হয়। তখন থেকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ‘প্রসারিত ভারত’, ‘ক্ষুদ্র চীন’ কিংবা ‘প্রশান্ত মহাসাগরীয়’ নামে অভিহিত হবার পরিবর্তে বর্মা, ভিয়েতনাম, ফিলিপিন্স প্রভৃতি নির্দিষ্ট নামে পরিচিতি লাভ করে। প্রকৃতপক্ষে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার পরিচিতি শুধু সামরিক গুরুত্বের উপর নির্ভরশীল নয়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এক প্রসারিত ভৌগোলিক অঞ্চল যার গৌরবোজ্জ্বল অতীত ও সমৃদ্ধ সংস্কৃতি রয়েছে। ১৯২০-৩০ এর দশক থেকে নৃতত্ত্ববিদ্ ও ঐতিহাসিকরা এখানকার সাদৃশ্যগুলি লক্ষ্য করছিলেন। এখানকার রাজকীয় দরবারে অনুসৃত নিয়মগুলি সমগ্র দ্বীপপুঞ্জে বর্তমান ছিল। এই নিয়ম প্রতিপালনই এখানকার ঐতিহ্য বা সাধারণ রীতি বলে গণ্য হতে থাকে। সমগ্র উপদ্বীপের সমাজজীবন ও পারিবারিক রীতির মধ্যে সাদৃশ্য ছিল। ভাষার মধ্যে ছিল সাদৃশ্য। ভিয়েতনাম ও কম্বোডিয়াতে, থাই ভাষা ব্যবহৃত হত দক্ষিণ চীন এবং বর্মার শান রাজ্যে (Shan State)। উত্তর মালয়েশিয়াতে এই ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে।

৬৫.২.২ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সংস্কৃতি ও সমাজ

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ইতিহাসে পশ্চিমী ভাবধারা ও বিদেশীয়দের ভূমিকার গুরুত্ব নির্ধারণ করতে গিয়ে ঐতিহাসিকরা যে প্রামাণ্য খুঁজে বার করলেন তা উদ্ভাসিত করল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রাচীন যুগের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আঞ্চলিক গঠন। সমন্বয়ের একটি চিত্র পরিস্ফুট হল। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াকে সাধারণভাবে বলা হয় বিভিন্ন সাংস্কৃতিক শক্তিগুলির মিলনক্ষেত্র। এখানকার ইতিহাস বিশ্লেষিত হয়েছে বিবিধ ভাবধারার আমদানি ও সাংস্কৃতিক আত্তীকরণের (absorb) প্রশ্নে। ভারত, চীন, ইসলাম, ইউরোপ, আমেরিকা থেকে একের পর এক সাংস্কৃতিক তরঙ্গ এখানে স্পষ্ট ছাপ ফেলেছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া তার সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ এবং প্রয়োজনের সঙ্গে মানিয়ে বিদেশী প্রভাব গ্রহণ করেছে। ভারতীয় শিল্পকলা, স্থাপত্য ও সংস্কৃতির এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকলেও পাগান

(Pagan), আঙ্কোর (Angkor) প্রভৃতির মন্দির স্থাপত্যে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নিজস্বতা বর্তমান। এই নিজস্বতা যা ধ্রুপদী নামে অভিহিত হবার যোগ্যতা রাখে। তা ধ্রুপদী (Classical) এই কারণে যেমন থাইল্যান্ডের বুদ্ধিমূর্তি, গঠনশৈলীতে যা ভারতের সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত নয় এখানে তার নিজস্ব শিল্পকলা বর্তমান।

সমাজব্যবস্থায় দেখা গেছে মহিলাদের স্থান যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ করে গ্রামীণ কৃষক সমাজে এবং সমাজে নারীর প্রতি বৃহত্তর মূল্যবোধের জাগরণের বিষয়টি ভারত, চীনের সমাজব্যবস্থার সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত নয়। একইভাবে এখানকার ছোট পরিবারের ধারণা যেমন গুরুত্ব লাভ করেছিল, ভারত বা চীনের বৃহৎ পরিবারের রীতি রেওয়াজের সঙ্গে যা সাদৃশ্যযুক্ত ছিল না। তাই বিদেশী ভাবধারা এখানে ছাপ ফেললেও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রয়োজনের সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে তা গৃহীত হয়েছিল। ভিয়েতনামে চীনা সংস্কৃতি গৃহীত হলেও তার সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ হয়নি। অন্যান্য অঞ্চলে ভারতীয় রীতি প্রচলিত হলেও তা স্থানীয় রেওয়াজকে নিশ্চিহ্ন করে নি। ইসলামীয় ভাষা মালয়েশিয়াকে আরব-জাতিভুক্ত করতে পারেনি। তাই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সংস্কৃতি বিদেশী উপনিবেশিকতাবাদের ফলশ্রুতি নয়। এখানকার ইতিহাসের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয় অধিবাসীদের মননগত ঐক্য, যা তাদের এক ঐতিহাসিক বন্ধনে আবদ্ধ করে রেখেছে এবং পৃথক সত্তা বজায় রাখতে সহায়তা করেছে।

৬৫.৩ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় পতুর্গীজ শক্তির আবির্ভাব

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে দুটি পর্যায়ে ইউরোপীয় আধিপত্য সম্পন্ন হয়েছিল। প্রথমত, নবজাগরণের ফলে সমগ্র ইউরোপের মনন জগতে যে আলোড়ন ওঠে তার ফলে দেশ আবিষ্কার ও জ্ঞানার্জনের তীব্র আকাঙ্খার হাত ধরে মানুষের মধ্যে দেশ আবিষ্কারের পদক্ষেপ গৃহীত হয়। পর্তুগাল, স্পেন, হল্যান্ড, আমেরিকা প্রভৃতি রাষ্ট্রগুলি দেশ আবিষ্কারে নেশায় উন্মুক্ত করে প্রাচ্যের দেশগুলিকে। দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন রাষ্ট্রের বাণিজ্যিক কোম্পানিগুলির চেষ্টায় প্রসারিত হয় ইউরোপীয় আধিপত্য। দ্বিতীয় পর্যায়ের এই উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্যে কাজ করেছিল শিল্প-বিপ্লবজাত প্রয়োজন। উৎপাদিত পণ্যের জন্য বাজারে প্রয়োজনীয়তা বিভিন্ন রাষ্ট্রকে উপনিবেশ লাভের জন্য অগ্রণী করে তোলে। ব্রিটিশ, ফরাসি ও ডাচ—'পূর্ব ভারত কোম্পানী'গুলি ধীরে ধীরে এশিয়ার বিভিন্ন প্রান্তে পৌঁছে যায় এবং বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা লাভে সক্রিয় হয়ে ওঠে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াকে আগ্রাসী বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতার সঙ্গে পরিচিত করিয়েছিল পর্তুগীজরা। ১৫১১ সালে পর্তুগীজরা অধিকার করে মালাক্কা। এছাড়াও অধিকৃত হয় মিন্দানাও (Mindanao), উত্তর মালয় ও আকে (Acheh)। প্রকৃতপক্ষে অন্যান্য ইউরোপীয় জাতির তুলনায় অনেক ছোট হওয়া সত্ত্বেও পর্তুগীজদের মধ্যেই ছিল তৎকালীন সমুদ্রযাত্রার ও নৌযুদ্ধের উন্নত পরিকল্পনা ও বিবিধ জ্ঞান। তাদের নৌবহরের গঠন বিশেষ করে নৌ-পরিচালন রীতি, নৌবাহিনীর উন্নত কলাকৌশল তাদের সমুদ্রযাত্রার অগ্রণী করে তুলেছিল তাই পর্তুগীজরা হয়ে উঠেছিল সমুদ্রযাত্রার পারদর্শী জাতি (meritime horde)।

৬৫.৩.১. পর্তুগীজদের বাণিজ্যিক কার্যকলাপ

সুগন্ধী মশলার আকর্ষণে পর্তুগীজরা এশিয়াতে উপস্থিত হয়। মালাক্কা অধিকৃত হবার পর তারা প্রাচ্য বণিকদেরও স্বাগত জানিয়েছিল যারা তাদের নিয়মরীতি অনুযায়ী ব্যবসা করতে স্বীকৃত হবে। এই সময় কিছু অমুসলমান ভারতীয়, চীনা, আকীনীয়ন (আকে অধিবাসী) বিরোধী সুমাত্রা ও জাভাবাসী এই ব্যবসায়িক সুবিধার ব্যাপারে উৎসাহী হয়ে ওঠে। ফলে দেখা গেল রপ্তানিযোগ্য দক্ষিণ-পূর্ব ভারতীয় পণ্য যেমন সুগন্ধী মশলা অর্থাৎ লবঙ্গ, জায়ফল, গোলমরিচ, দারুচিনি প্রভৃতি এবং আরো কিছু কৃষিজ তুলো, ধান ইত্যাদির অপ্রতুলতা। কারণ আকীয়ন, জাভাবাসী চীনারা পর্তুগীজ নিয়ন্ত্রণের বাইরে থেকে বাণিজ্যিক বিনিময় করতে থাকে। এরপর থেকে উৎপাদন ও সরবরাহের উপর নিয়ন্ত্রণের সমস্যা সমাধানের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। তাই যে সব উপদ্বীপে মশলার উৎপাদন হতো যেমন ইন্দোনেশিয়ার পূর্বভাগ, টাইডোর (Tidore), টারনেট (Ternate), আমবোনিয়া (Ambonia) প্রভৃতি ষোড়শ শতকের মধ্যে পর্তুগীজ দ্বারা অধিকৃত হয়।

এইসব অঞ্চলের মুসলিম শাসক, সুলতানরা পর্তুগীজদের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন যাতে দুপক্ষই লাভবান হয়েছিল। রাজারা যেমন স্থানীয় শত্রু ও মশলা উৎপাদক অঞ্চলের সামরিক অভিযানে পর্তুগীজ সাহায্য পেতেন তেমনই পর্তুগীজরাও যেসব অঞ্চলের জন্য চুক্তি হয়নি সেখানকার মশলা ও কৃষিজ পণ্য লাভের জন্য সুলতানদের সহযোগিতা পেতেন। এইভাবে পারস্পরিক সহায়তরা দ্বারা উভয় পক্ষ লাভবান হত এবং দেখা গেছে এখানকার রপ্তানীজাত মশলা বিশ্বের বাজারে খুব চড়া মূল্যে বিক্রিতে হয়েছে। আর একথা সত্য যে, পর্তুগীজ আধিপত্য ও একচেটিয়া বাণিজ্য সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে প্রসারিত না হলেও তা কিন্তু লাভজনক ছিল।

৬৫.৩.২ মিশনারীদের প্রয়াস

পর্তুগীজ মিশনারীরা এখানকার অনাথ শিশুদের ধর্মান্তকরণ, ক্রীতদাস, দরিদ্র ও অসহায়দের সহায়তা দান, মহিলাদের পুনর্বাসন প্রভৃতি ধর্মমূলক ও সংস্কারমূলক কাজ করতেন। তবে পতুর্গীজ মিশনারীরা সর্বাপেক্ষা সাফল্য লাভ করেছিল জাপানে। এখানে প্রায় তিন লক্ষ জাপানীকে ব্যাপটাইজ্ড বা ধর্মান্তরিত করা হয়েছিল ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগের মধ্যেই। এখানে আরো একটি বিষয় স্পষ্ট ছিল যে সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার যে সব অঞ্চলে পর্তুগীজ আধিপত্য প্রসারিত হয়েছিল, বাণিজ্য পরিচালিত হয়েছিল সেখানে অর্থনৈতিক কিংবা প্রশাসনিক সংহতি সাধনের বিষয়টি অবহেলিত ছিল কারণ কোন ঔপনিবেশিক বা সামরিক কাঠামো এখানে অনুপস্থিত ছিল।

পর্তুগীজরা কোন শিল্পসমৃদ্ধ রাষ্ট্রের অধিবাসী ছিলেন না। তাই এখানে অন্যান্য ইউরোপীয় রাষ্ট্রের উপনিবেশগুলির মতো অবধারিত ভাবে পরিবর্তনের জোয়ার আসেনি। কারণ কোন নতুন প্রশাসনিক, বাণিজ্যিক কাঠামো প্রস্তুত হয়নি আর আবশ্যিকভাবে জাতীয়তাবাদী বৈপ্লবিক আন্দোলন শুরু হয়নি। পর্তুগীজ রাজনৈতিক প্রসারণকালে স্থানীয় অঞ্চল, অর্থনীতি নিরুপদ্রব ছিল।

পর্তুগীজদের মধ্যে একটি প্রবাদবাক্য প্রসিদ্ধ ছিল যে ঈশ্বর তাঁদের একটি ক্ষুদ্র জন্মভূমি দিয়েছেন সত্য কিন্তু কবরখানাটি দিয়েছেন পৃথিবী জুড়ে। বাস্তবিক পক্ষে এই সমুদ্র অভিযাত্রী জাতিটির মৃত্যুহার দক্ষিণপূর্ব এশিয়াতে অনেক বেশি ছিল। এদের মধ্যে পারস্পরিক নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হত আর ক্রান্তীয় অসুখে অনেকেই মারা যেত, এইভাবে পর্তুগীজ জনসংখ্যা হ্রাস পেতে থাকে। এছাড়া নৌবহরের হারও কমে গিয়েছিল। এর ফলে পর্তুগীজরা দক্ষিণপূর্ব এশিয়াতে আধিপত্যের প্রসারণ তো দূর তাকে স্থিতিশীলতাও দিতে পারেনি। ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে স্পেনীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতা পর্তুগীজদের দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে সরে যেতে বাধ্য করে।

৬৫.৩.৩ পর্তুগীজদের বিরুদ্ধে দ্বীপবাসীদের প্রতিক্রিয়া

বিশ্বের বাজারে পর্তুগীজ সরবরাহকৃত মশলার অন্যতম প্রতিযোগী হয়ে দাঁড়িয়েছিল স্পেন। প্রশান্ত মহাসাগরীয় পথে ইউরোপ ও পূর্ব এশিয়ার দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে নতুন যাত্রাপথ আবিষ্কার করে স্পেনীয় বা পর্তুগীজদের কাছে আশঙ্কার কারণ হয়ে ওঠে। ১৫২৭, ১৫২৮ এবং ১৫৪০-এর দশকে স্পেনীয়রা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে একের পর এক আসতে থাকে। ১৫৭৪ সালের মধ্যেই পর্তুগীজ কর্তৃত্ব এই উপদ্বীপে অনেকখানি শিথিল হয়ে গিয়েছিল। এই সময়েই পর্তুগীজ দুর্ব্যবহার ও নিষ্টুরতার বিরুদ্ধে মশলা উৎপাদক দ্বীপ টারনেট বিদ্রোহে জ্বলে ওঠে ও পর্তুগীজদের তাড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়। ১৫৮০ সালে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে পরিবর্তন এল স্পেনরাজ দ্বিতীয় ফিলিপ স্পেন ও পর্তুগালকে একত্র করে দেন। পরবর্তী ছয় দশকে ওলন্দাজ, ব্রিটিশ, স্পেনীয়রা পর্তুগীজদের যাবতীয় বাণিজ্যিক সুবিধা করায়ত্ত করে নিয়ে পর্তুগীজদের প্রায় নিশ্চিহ্ন করে দেয় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে। প্রকৃতপক্ষে প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠান, সম্পদ ও লোকসংখ্যার অভাবহেতু পর্তুগীজরা এখানে তাদের সাম্রাজ্য ধরে রাখতে পারেনি।

৬৫.৪ ওলন্দাজ ঔপনিবেশিক বিস্তার

ষোড়শ শতকের শেষভাগে ডাচ বা ওলন্দাজরা মশলা ব্যবসায়ে পদার্পণ করে। ষোড়শ শতাব্দীতে ডাচ প্রতিপত্তি পুরোপুরি নির্ভরশীল ছিল লিসবন তথা পর্তুগালের রাজধানী থেকে উত্তর ইউরোপের বন্দরগুলিতে মশলা বিতরণের উপর। ১৫৯৪ সালে স্পেনরাজ দিতীয় ফিলিপ এক আদেশনামায় পর্তুগালের বন্দরগুলিকে ডাচ বণিকদের জন্য রুদ্ধ করেছিলেন। প্রায় তিরিশ বছর ধরে তিনি প্রটেস্টান্ট ডাচদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। এবার তিনি হল্যান্ডকে অর্থনৈতিক দিক থেকে ধ্বংস করার জন্য এই আদেশনামা জারি করলেন। ডাচরা তখন বিকল্প উপায় হিসাবে মশলাদ্বীপের ঘাঁটিগুলিতে তাদের বাণিজ্যতরী পাঠাতে মনস্থির করে। ১৫৯৫ সালে গঠিত হয় (অনেকগুলি বাণিজ্য কোম্পানি একত্র হয়ে) ভারেনদি অস্টানডিচ কোম্পানি সংক্ষেপে VOC ইউনাইটেড ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। এরা প্রায় দুই শতক দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সামুদ্রিক বাণিজ্যে আধিপত্য করেছিল। ১৫৯৬ সালে প্রাচ্যে উপস্থিত হয় প্রথম ডাচ বাণিজ্যতরী।

৬৫.৪.১ ইন্দোনেশিয়াতে ডাচ কর্তৃত্ব স্থাপন

১৫৯৬ সালের প্রথমদিকে জাভার পশ্চিম উপকূলের ছোট বন্দর শহর Bantam-এ ডাচ জাহাজ এসে উপস্থিত হয়। এখানকার স্থানীয় আধিকারিক ও ডাচদের সঙ্গে সম্পাদিত হয় একগুচ্ছ সন্ধিচুক্তি যা পরবর্তীকালে হল্যান্ডের শাসন সমগ্র ইন্দোনেশিয়াতে প্রসারিত করতে সহায়তা করে।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দ্বীপপুঞ্জে মশলা ব্যবসায়ে একচ্ছত্র আধিপত্য স্থাপনের প্রবণতা ডাচদের অন্যান্য ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখোমুখি করে তোলে। কারণ অন্য রাষ্ট্রগুলিও সমভাবে বাণিজ্যে আগ্রহী ছিল। ১৬০০ সালে ১২৫ জন ইংরেজ বণিকদের নিয়ে গঠিত হল জয়েন্ট স্টক কোম্পানি, যারা ১৬০০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর লাভ করল রাজকীয় সনদ, এই জয়েন্ট স্টক কোম্পানি পরিচিত লাভ করে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি নামে। এই কোম্পানিকে ভারত, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার উপদ্বীপে বাণিজ্যের অধিকার দেওয়া হয়। একই সঙ্গে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের জনবহুল অংশ বিজয় ও প্রশাসনের অধিকারও পায়। ১৬১৯ সালের মধ্যে বান্টম, জাকার্তা, আমবোয়ানা বান্দা প্রভৃতি অঞ্চলে স্থাপিত হয়ে যায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্যকেন্দ্র। এখানে ডাচ বাণিজ্যকেন্দ্রও ছিল তাই প্রতিদ্বন্দ্বিতা অনিবার্য হয়ে যায়। তাই প্রতিদ্বন্দ্বিতা এড়াতে দুটি রাষ্ট্র ব্রিটেন ও হল্যান্ড ইউরোপে চুক্তিবদ্ধ হয়ে প্রাচ্য বাণিজ্যের ভাগ করে নেয়।

৬৫.৪.২ ডাচ কর্তৃত্ব স্থাপনে V.O.C.-র ভূমিকা

VOC-র প্রতিনিধি প্রাচ্য থেকে একাধিপত্য ত্যাগ করতে রাজী ছিলেন না। VOC-এর গভর্নর জেনারেল জাঁ পিটারসন কোন (Jan Pieterson Coen) স্থানীয় শাসকদের সঙ্গে কিছু চুক্তি সম্পাদন করলেন যাতে এই উপদ্বীপ থেকে ব্রিটিশদের উচ্ছেদ করা যায়। তাঁর আদেশে ১৬২৩ সালে আমবোয়ানা দ্বীপে ইংরেজদের বিরুদ্ধে এক হত্যাকান্ড সংঘটিত হয় ফলশ্রুতিতে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে তাদের বাণিজ্যকেন্দ্র পরিত্যাগ করে এবং সম্পূর্ণ মনোনিবেশ করে ভারতবর্ষের উপর। Coen বা কোন এর সময়ে VOC-একটি সংঘবদ্ধ কোম্পানি রূপে উদ্ভূত হয়। ডাচ বাণিজ্যিক সাম্রাজ্যের একটি শক্তিশালী ভিত্তি হিসাবে পরিগণিত হতে থাকে। পরবর্তী তিন শতক এই VOC খুব দক্ষতার সঙ্গে বাণিজ্য পরিচালন ও নীতি নির্ধারণ করতে থাকে। ব্রিটিশদের সঙ্গে ডাচরা পর্তুগীজ প্রতিদ্বন্দ্বিতাও করেছিল। পর্তুগীজ বাণিজ্যঘাঁটি মালাক্কা ১৬৪১ সালে ডাচ অধিকৃত হয়। এইভাবে ডাচরা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার গুরুত্বপূর্ণ প্রাচীন রাজধানী শুন্ড (Sunda)-র উপর নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করে।

৬৫.৫ ডাচ বাণিজ্যিক সংগঠন

ডাচদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বাণিজ্য। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে কোন রাজ্যিক (teritory) উদ্দেশ্য তাদের ছিল

না। স্থানীয় জনগণের মধ্যে ধর্মান্তকরণের মাধ্যমে কোনরূপ আধ্যাত্মিক উন্নতি কিংবা জাগতিক উন্নয়ন সাধন কোনটাই ডাচ বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ছিল না। অন্য কোন পশ্চিমী রাষ্ট্রের প্রতিদ্বন্দ্বিতা কিংবা অর্থনৈতিক ও সামরিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছাড়া কোনরূপ প্রত্যক্ষ প্রশাসনিক দায়িত্ব ডাচরা এড়িয়ে যেতেন। একমাত্র বাটাভিয়া (জাকার্তার ডাচ নামকরণ)-তে আধিপত্য বজায় রাখার জন্য VOC-কে কিছু অংশ অধিগ্রহণ করতে হয়েছিল এবং তার প্রত্যক্ষ প্রশাসন বজায় রাখতে হয়েছিল। অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত ডাচরা সন্ধি চুক্তি স্বাক্ষর করে দেশীয় শাসকদের স্থানীয় প্রশাসনের ভার দিয়ে বিনিময়ে মশলা ও ভোগ্যপণ্য সরবরাহের ব্যাপারেই উৎসাহী ছিল। কারণ রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব, আন্তঃরাজ্য বিভেদ প্রভৃতি বাণিজ্যিক আদান-প্রদান প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। এসত্ত্বেও ব্রিটিশদের বাণিজ্যিক কারণে ডাচরাও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে জড়িয়ে পড়ে। জাভার পশ্চিমে কান্টন রাজ্য ও কেন্দ্রে এবং পূর্বে মাতরম (Mataram) রাজ্য ছিল এই দ্বীপের প্রতিদ্বন্দ্বী রাজ্য। রাজ্যগুলি ডাচ কোম্পানির হস্তক্ষেপের বিরোধিতা করলেও কখনোও একজোট হতে পারেনি। ডাচরাও এখানকার রাজনীতিতে ব্রিটিশদের মতো হস্তক্ষেপ করত। সপ্তদশ শতকের শেষে দেখা গেল ডাচ কোম্পানী তাদের মনোনীত প্রার্থী বা ব্যক্তিকে উভয় রাজ্যের শাসক নিযুক্ত করছেন। এই রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের উদ্দেশ্যই হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক অঞ্চলের নিরাপত্তা প্রদান। এইভাবে কিছু অঞ্চলে প্রত্যক্ষ শাসন ও দূরবর্তী অঞ্চলে অছি দ্বারা প্রশাসন চালিয়ে ১৭৭০ সালের মধ্যে VOC সমগ্র জাভার উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে, যা একসময়ে বান্টম ও মাতারমের নিয়ন্ত্রণে ছিল।

৬৫.৬ ডাচ বাণিজ্যিক নিয়ন্ত্রণ ও তার প্রকৃতি

ডাচরা জাভায় কোন নতুন রাজনৈতিক কাঠামো নির্মাণ করেনি। ইন্দোনেশিয়ার প্রাচীন রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কাঠামো অব্যাহত রেখে ডাচরা জাভার দেশীয় রাষ্ট্রপ্রধান ও কোম্পানির মধ্যে যে কোন মারাত্মক সংঘর্ষ এড়িয়ে যেতে পেরেছিল। শাসক ও শাসিতের মধ্যে ঐতিহ্যগত সম্পর্কে কোন পরিবর্তন আসেনি। এই অপ্রত্যক্ষ ও রীতি বহির্ভূত শাসনের মধ্যে দিয়ে যেমন অনিবার্যভাবে সমগ্র জাভায় ডাচ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিতও হল আবার তেমনই আশ্চর্যভাবে লোকক্ষয় ও রক্তপাত ও অর্থক্ষয় হল না। স্থানীয় শাসকরাই নিয়ন্ত্রণ করতেন বাণিজ্য। তারা কৃষক প্রজাদের কাছে সর্বময় প্রভু হয়ে উঠলেন। এই প্রশাসক বণিকরা VOC-র অনুমোদিত বাণিজ্যরীতি মেনে চলতেন। এই শাসকরা অন কোন পাশ্চাত্য গোষ্ঠীর সঙ্গে ষড়যন্ত্র করলে তারা সঙ্গে সঙ্গে শাসনক্ষমতা থেকে বিচ্যুত হতেন। সপ্তদশ শতকের শেষভাগে এরা VOC-র জবরদস্তি যোগানদারে পরিণত হয়েছিলেন যাদের বলা হত Leverinen। এরা স্থানীয় বন্দরে কোম্পানী গুদামঘরে (warehouse) নির্দিষ্ট ওজনের পণ্যদ্রব্য নির্দিষ্ট মূল্যে সরবরাহ করতেন। এইভাবে বান্টম নির্দিষ্ট পরিমাণ গোলমরিচ এবং মাতরম মাদুরার শাসন নির্দিষ্ট পরিমাণ চাল সরবরাহের জন্য দায়বদ্ধ ছিল। এই ব্যবস্থা পরে আরো বিধিবদ্ধ রূপ নিয়েছিল এবং আরো বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয়েছিল। ১৮৩০ সালের থেকে ভ্যান ডেন বস তাঁর এই ব্যবস্থা "কালচার সিস্টেম" জন্য প্রসিদ্ধ হয়ে আছেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে পশ্চিম জাভার প্রেয়াঙ্গার, আমবোয়ানা, বান্দা প্রভৃতি ডাচ শাসনে চলে আসে এবং এখানকার কৃষকরা রপ্তানিযোগ্য পণ্য উৎপাদনে বাধ্য হয়। এই শতকের মধ্যভাগে জাভার যেসব অঞ্চলে মশলার উৎপাদন হত সেখানে কফি, নীল, আখ প্রভৃতি চাষ মশলার মতো সমান গুরুত্বপূর্ণ হারে করা হতে থাকে। ইউরোপীয় বাজারে চাহিদার সঙ্গে সংগতি রেখে পণ্যের আকার ও দাম নির্ধারিত হতে থাকে। গরিব চাষীদের অনেক সময় উচ্চমূল্যে আমদানিকৃত চাল কিনতে হত VOC-র প্রত্যক্ষ প্রশাসনাধীন অঞ্চলে মশলার যেমন জায়ফল, লবঙ্গ প্রভৃতির অতিরিক্ত উৎপাদন বন্ধ করে তা কিছু কিছু অঞ্চলে সীমাবদ্ধ করা হয়। এছাড়া পাহারাদারী জাহাজগুলিও নিষিদ্ধ অঞ্চলে মশলার গাছগুলিকে বিনষ্ট করে দিত।

৬৫.৬.১ বাণিজ্যিক নিয়ন্ত্রণের ফলশ্রুতি

এইভাবে ব্যাপক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ডাচরা একদিকে যেমন নিরঙ্কুশ বাণিজ্যিক একাধিপত্য লাভ করে তেমনই ডাচ রণতরী অনেক দক্ষ হয়ে ওঠে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয় দ্বীপপুঞ্জ ও ইউরোপের মধ্যে বাণিজ্যিক আদান-প্রদানে এইভাবে ডাচরা বিশিষ্ট স্থানাধিকার করে। তবে এর ফলে জাভার স্থানীয় শিল্প ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং অ-রপ্তানিযোগ্য পণ্যের উৎপাদন মার খেতে থাকে। অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগে ডাচ উপস্থিতিতে জাভার স্থানীয় উৎপাদন ও শিল্প ধ্বংস হয়ে যায়। ডাচরা শুধুমাত্র বাণিজ্য ও লাভের উপর সবিশেষ জোর দেবার ফলে ইন্দোনেশিয়ার ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাক্ষেত্রে কোন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেনি। এমন কি উপকূলবর্তী কিংবা মূল ভূখণ্ড কোথাও পাশ্চাত্য প্রভাব দেখা গেল না। অথচ ডাচ আগমনের ফলে এটা অবশ্যম্ভাবী ছিল। উনবিংশ শতকের শেষভাগ পর্যন্ত জনজীবন ইউরোপীয় প্রভাবমুক্ত ছিল। জাভার সংস্কৃতিকে ওলন্দাজ শাসন প্রভাবিত করতে পারেনি। কয়েক শতক পূর্বে ওলন্দাজ আগমনের পূর্বে যেমনটি ছিল তেমনই চলছিল। ডাচ উপনিবেশিক প্রশাসক যারা এখানে বাণিজ্য চালাচ্ছিলেন তাদেরও এই অঞ্চলের বিখ্যাত সংস্কৃতি সম্পর্কে কোন ধারণা ছিল না। এমনকি উনবিংশ শতকের সূচনার সময়কালেও ডাচরা ইন্দোনেশিয়ার বৌদ্ধ ধর্মান্দোলন সম্পর্কে কিছুই জানত না। এছাড়া জাভার কেন্দ্রে যোগীয়াকার্তার (Yogyakarta) কাছে যে বিশ্ববিখ্যাত বরোবদুরে বৌদ্ধ স্তূপটি রয়েছে তার সম্পর্কেও অজ্ঞাত ছিল। এই স্তূপের আবিষ্কার হল নেপোলিয়নের যুদ্ধের পর ব্রিটিশদের দ্বারা। যখন ব্রিটিশরা ইন্দোনেশিয়ায় তাদের ঔপনিবেশিক ভূমিকা পালন করতে শুরু করে তখনই উন্মোচিত হয় জাভার এই বিশাল বিখ্যাত সংস্কৃতিক সম্পদ।

৬৫.৬.২ স্থানীয় জনজীবনের উপর ওলন্দাজ বাণিজ্যিক নিয়ন্ত্রণের প্রভাব

তবে যেসব জায়গা VOC প্রত্যক্ষ প্রশাসনের আওতায় ছিল যেখানকার জনজীবন ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হত। কারণ সেখানকার মানুষ এই ডাচ কোম্পানির জন্য বাণিজ্যিক ফসলের উৎপাদন থেকে শুরু করে পণ্য গুদামজাত

করা পর্যন্ত সবই কাজ করত। এই অতিরিক্ত পরিশ্রম সাধারণ জীবনযাত্রার কোন হিত সাধন করেনি। ডাচরা উৎপাদিত পণ্য যতটা সম্ভব উচ্চমূল্যে ইউরোপের বাজারে বিক্রয় করত এবং সর্বনিম্ন মূল্যে এশিয়া বাজারে ক্রয় করত। এইভাবে ডাচ কোম্পানি যেমন বাণিজ্যিক আধিপত্য স্থাপন করেছিল তেমনভাবে বঞ্চিত করে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয় উপদ্বীপের কৃষক সমাজের। কৃষকরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল দুইভাবে, প্রথমত, তারা মরশুমের (seasonal) ফসলের পরিবর্তে অর্থাৎ তাদের প্রয়োজনীয় শস্যের উৎপাদনের পরিবর্তে বাণিজ্যিক পণ্য উৎপাদন করতে বাধ্য হত। এতে তাদের খাদ্যাভাব বৃদ্ধি পেত। দ্বিতীয়ত, উৎপাদিত পণ্যে বিক্রিতে মূল্যের উপর তারা কোন লাভ পেত না। বাণিজ্যের পুরোলাভটাই যেত ডাচ কোম্পানীর কাছে। বিদেশী বাণিজ্যের কোন অধিকার স্থানীয় মানুষের ছিল না আর তারা নিজভূমিতে উৎপাদিত পণ্যের বিক্রয়মুল্য সর্বনিম্ন হারে পেত। ডাচ কোম্পানীর শাসনকালে ইন্দোনেশিয়ার সাধারণ কৃষকসমাজ খুবই নিপীড়িত ও অসহায় হয়ে পড়েছিল।

৬৫.৭ ইন্দোনেশিয়ার অর্থনীতিতে ডাচ বাণিজ্যের প্রভাব

ইন্দোনেশিয়ার অর্থনীতিকে ব্যবহার করে ডাচ কোম্পানি যে অসম্ভব আর্থিক শক্তি সঞ্চয় করেছিল তার পরিবর্তে ইন্দোনেশিয়া অর্থনীতির সামান্যতম বিকাশ বা উন্নয়নের চেষ্টা ডাচ কোম্পানির পক্ষ থেকে দেখা যায়নি। ইন্দোনেশিয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থা দুইভাবে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল বাণিজ্যিক অর্থনীতি ও কৃষিজ অর্থনীতি। ডাচরা একাধিপত্য স্থাপন করেছিল বাণিজ্যে ফলে স্থানীয় দেশীয় বাণিজ্য, পণ্যশিল্প ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল। কিছু দেশীয় বাণিজ্যপথ রুদ্ধ হয়ে যায় আর কিছু পথে ডাচ আধিপত্য প্রতিষ্ঠা হয়। দেশীয় শিল্প, বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত কিছু মানুষ সরবরাহের কাজে লিপ্ত হয় অর্থাৎ ডাচ কোম্পানিগুলির দালালে পরিণত হয়, কেউ জলপথে বাণিজ্যের লভ্যাংশ আদায় করতে জলদস্যুবৃত্তি নেয়। এই জলদস্যুতা সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে এক বিরাট সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ইন্দোনেশিয়ার উত্তর-পশ্চিমে সুলায়াসীর বুগীদের জীবনযাত্রা বিশেষ করে নির্ভরশীল ছিল Peddler system ফেরী ব্যবস্থা অর্থাৎ এক স্থানের পণ্য অন্যত্র সরবরাহের উপর আর এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ডাচ কর্তৃত্ব। এছাড়া বুগীরা জলপথে বাণিজ্য করত। তাদের জীবিকা নির্বাহের এই ক্ষেত্রটিও ডাচ কর্তৃক অধিকৃত হয়েছিল। ডাচদের বাণিজ্যেক একচেটিয়া অধিকার এই উপদ্বীপের জীবনযাত্রায় প্রভূত ক্ষতিসাধন করেছিল।

৬৫.৮ সারাংশ

আলোচ্য এককটিতে ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকতাবাদের দুটি পর্যায় আলোচিত হয়েছে। পর্তুগীজরা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সর্বত্রই ঘাঁটি স্থাপন করলেও কোন স্পষ্ট বাণিজ্যিক কাঠামো নির্মাণ করেনি। ব্যতিক্রমীভাবে ডাচ তথা

ওলন্দাজরা বাণিজ্য কোম্পানির নেতৃত্ব ইন্দোনেশিয়াতে নিয়ে এল রূপান্তর। এই রূপান্তর কিন্তু নিতান্তই বাণিজ্যিক প্রয়োজনে গৃহীত হয়েছিল। ইন্দোনেশিয় দ্বীপপুঞ্জের সর্বাঙ্গীন উন্নতিকল্পে কোন প্রয়াস বা পদক্ষেপ গৃহীত হতে দেখা যায়নি।

৬৫.৯ অনুশীলনী

ক। বিষয়মুখী প্রশ্ন

১। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া কি নামে অভিহিত হত?

২। মালাক্কা কত সালে অধিকৃত হয়?

৩। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয় উপমহাদেশে অভিযানের মূলে কিসের আকর্ষণ কাজ করেছিল?

৪। উপমহাদেশে প্রাপ্ত মশলাগুলির নাম লিখুন।

৫। পর্তুগীজ মিশনারীরা এখানে কি কি কাজ করতেন?

৬। পর্তুগীজ জনসংখ্যা হ্রাসের কারণগুলি কি কি ছিল এই উপমহাদেশে?

৭। পর্তুগীজ অভিযাত্রীদের মধ্যে প্রচলিত প্রবাদবাক্যটি কি?

৮। একটি ওলন্দাজ পূর্ব ভারত কোম্পানির নাম লিখুন।

৯। কত সালে প্রাচ্যে প্রথম ডাচ বাণিজ্যতরী উপস্থিত হয় এবং কোথায়?

১০। জাভার বিশাল সাংস্কৃতিক সম্পদটি কি?

খ। সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্ন

১। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সমাজ ও সংস্কৃতির উপর আলোকপাত করুন।

২। প্রাচ্য দেশ আবিষ্কারের মূলে কী কারণ ছিল?

৩। পর্তুগীজরা সমুদ্রযাত্রায় কেন পারদর্শী হয়ে উঠেছিল?

৪। পর্তুগীজ মিশনারীদের কার্যকলাপ বর্ণনা করুন।

৫। ডাচ বাণিজ্যিক নিয়ন্ত্রণের প্রকৃতি কী রূপ ছিল?

গ। দীর্ঘ উত্তরের প্রশ্ন

১। ইন্দোনেশিয়ার অর্থনীতিতে ডাচ বাণিজ্যের প্রভাব কী ছিল?

২। ডাচ কর্তৃত্ব স্থাপনে V.O.C.-র ভূমিকা বর্ণনা করুন।

৩। পর্তুগীজ বাণিজ্যিক কার্যকলাপ আলোচনা করুন।

৪। ডাচ বাণিজ্যিক সংগঠনের উপর একটি চিত্র প্রস্তুত করুন।

৬৫.১০ গ্রন্থপঞ্জী

1. Milton Osborne—South-East Asia—An Introductory History. George Allen and Unwin 1979
2. Lea E. Williams—South-East Asia—A History, O.U.P. 1976.
3. D. R. Sardesai—South-East Asia—Past and Present, Vikas Publishing 1981.
4. J. F. Cady—South-East Asia—Its historical developments. Mcgraw Hill 1979.
5. M. N. Venkata Ramanappa—Modern Asia, Vikas Publishing 1979.

একক ৬৬ ❑ ব্রহ্মদেশ ও মালয়ে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আগ্রাসন

গঠন

৬৬.০ উদ্দেশ্য
৬৬.১ প্রস্তাবনা
৬৬.২ ইঙ্গো-ব্রহ্ম বিরোধিতার কারণ
৬৬.৩ বর্মার সমাজব্যস্থা ও বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী
  ৬৬.৩.১ বর্মী রাজতন্ত্রের উপর এই জাতিগোষ্ঠীর প্রভাব
  ৬৬.৩.২ ব্রহ্মের কুনবঙ রাজতন্ত্র ও ব্রিটিশ হস্তক্ষেপ
  ৬৬.৩.৩ প্রথম ইঙ্গো-ব্রহ্ম যুগের কারণ
  ৬৬.৩.৪ যুদ্ধের ফলাফল
৬৬.৪ দ্বিতীয় ইঙ্গো-ব্রহ্ম যুদ্ধের কারণ
  ৬৬.৪.১ দ্বিতীয় যুদ্ধ ও ফলশ্রুতি
  ৬৬.৪.২ ব্রহ্মরাজ মিন্দন ও ইঙ্গো-ব্রহ্ম সম্পর্ক
৬৬.৫ তৃতীয় ইঙ্গোব্রহ্ম যুদ্ধের কারণ
  ৬৬.৫.১ থিবো ও ব্রহ্ম-ফরাসী সম্পর্ক
  ৬৬.৫.২ তৃতীয় ইঙ্গো-ব্রহ্ম যুদ্ধ ও বম্বে-বর্মা ট্রেডিং কোম্পানির ভূমিকা
৬৬.৬ মালয়ী রাজ্যে ঔপনিবেশিকতার সূচনা
  ৬৬.৬.১ ইন্দোনেশিয়-মালয়ী সাম্রাজ্যে ডাচ্ আধিপত্য
  ৬৬.৬.২ ব্রিটিশ প্রতিক্রিয়া
  ৬৬.৬.৩ ব্রিটিশ গভর্নর র‍্যাফেলসের ভূমিকা
  ৬৬.৬.৪ র‍্যাফেলসের কার্যকলাপের ফলাফল
  ৬৬.৬.৫ তাঁর নীতির সীমাবদ্ধতা
৬৬.৭. মালয়ী রাজ্যে ওলন্দাজদের পুনরুত্থান
  ৬৬.৭.১ সিংগাপুরের প্রতিষ্ঠা

৬৬.৭.২ সিংগাপুরের বাণিজ্যিক গুরুত্ব
৬৬.৭.৩ ১৮২৪ সালের চুক্তি ও মালয়ী রাজ্যে ব্রিটিশ প্রতিষ্টা লাভ
৬৬.৭.৪ ১৮২৪ সালের পরবর্তী সমস্যাগুলি
৬৬.৭.৫ আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি
৬৬.৭.৬ মালয়ী ফেডারেশন প্রতিষ্ঠা
৬৬.৮ সারাংশ
৬৬.৯ অনুশীলনী
৬৬.১০ গ্রন্থপঞ্জী

৬৬.০ উদ্দেশ্য

বর্তমান এককটি পাঠ করে আপনারা ব্রহ্মদেশ (বর্মা) ও মালয়ের রাজতন্ত্র ও সমাজব্যবস্থার নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি অবগত হবেন—

- বর্মা ও মালয়ের বহুজাতিভিত্তিক সমাজ।
- বর্মার রাজতন্ত্রের এবং মালয়ের সুলতানী রাজ্যগুলির ঐতিহ্য।
- দুটি রাষ্ট্রে ব্রিটিশ বণিকদের সুবিধালাভের জন্য প্রচেষ্টা।
- পরস্পর তিনটি যুদ্ধে বর্মাকে ভারতের প্রদেশে পরিণত করা।
- মালয়ী রাজ্যের উপর ভারতস্থিত ইন্ডিয়া অফিসের অধিকার স্থাপন এবং পরে মালয়ী ফেডারেশন প্রতিষ্ঠা।

৬৬.১ প্রস্তাবনা

অষ্টাদশ শতকের শেষভাগ পর্যন্ত ব্রহ্মদেশে ইউরোপীয় প্রসারণের ক্ষেত্র হয়ে উঠতে পারেনি। কারণ ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত ইউরোপীয় প্রভাব সীমাবদ্ধ ছিল দ্বীপপুঞ্জগুলিতে। দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার মূল ভুখন্ড অঞ্চল যেমন ব্রহ্মদেশ, থাইল্যান্ড প্রভৃতি অংশে ঐতিহ্যবাহী রাজতন্ত্রের দ্বারা প্রসাশন পরিচালিত হত। তাই বর্মায় কেন্দ্রীভূত রাজতান্ত্রিক একটা ঐতিহ্য ছিল। এখানে ছিল জাতি উপজাতি দ্বন্দ্ব, তাদের অনৈক্য ছিল ব্রহ্মদেশের জটিল সমস্যা। এই রাজনৈতিক সংহতিকরণের প্রয়াস ব্রহ্মদেশে পরিবর্তনের সূচনা করে। ইতিপূর্বে বর্মায় তথা ব্রহ্মে সংঘর্ষের প্রতিদ্বন্দ্বিতার সূচনা হয়েছে থাইল্যান্ডের সঙ্গে এবং বহুবার থাই-বর্মী যুদ্ধও সংঘটিত হয়েছে। কিন্তু অষ্টদশ শতকের

শেষভাগে এক শক্তিশালী রাজতন্ত্রের উত্থান বর্মায় রাজনৈতিক সংহতি নিয়ে আসে। তবে শক্তিশালী ইউরোপীয় উপনিবেশিকদের কাছে এই রাজতন্ত্র কিন্তু ততটা ক্ষমতাশালী ছিল না। যদিও এই রাজতন্ত্রের নিয়ন্ত্রণে ছিল বর্মার প্রসারিত অঞ্চল। সুবিন্যস্ত অর্থনীতি তবুও তা ঔপনিবেশিক ইউরোপীয় শক্তির কাছে নিতান্তই অপ্রতুল ছিল। তাই দেখা গেল শক্তিশালী টৌঙ্গু রাজতন্ত্র (১৫৩১-১৭৩২) এবং কনবঙ রাজতন্ত্র (১৭৭২-১৮৮৫)-কে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকদের হাতে বর্মাকে ছেড়ে দিতে হয়। তবে ব্রিটিশ প্রসারণ এখানে দ্রুতগতিতে সম্পন্ন হয়েছিল। তিনটি ইঙ্গো-ব্রহ্ম যুদ্ধে ১৮২৪, ১৮৫২, ১৮৮৫ বর্মায় ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক প্রসারণ সম্পন্ন হয়।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয় উপমহাদেশের দ্বীপ অঞ্চলগুলির মধ্যে খনিজ ও বনজ সম্পদে সমৃদ্ধশালী রাষ্ট্রের মধ্যে মালয় বা মালয়েশিয়া অন্যতম। ১৫১১ সালে তৎকালীন মালয়ের অন্যতম ও গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল মালাক্কা অধিকার করে নেয় পর্তুগীজরা। মালাক্কা মশলা বাণিজ্যের অন্যতম প্রধান কেন্দ্রও হয়ে ওঠে। ১৬২০ সালের মধ্যে এখানে ওলন্দাজদের প্রাধান্য হ্রাস পায় এবং ব্রিটিশ আগ্রাসন শুরু হয়। ১৭৮৬ সালে মালয়ী দ্বীপ পেনাঙ (Penang) অধিকার করে নেয় ব্রিটিশরা এবং ১৮২৪ সালের মধ্যে সিঙ্গাপুর ব্রিটিশ অধিকারে চলে আসে।

ওলন্দাজরা প্রধানত মশলা ব্যবসায়ে নিজেদের সীমাবদ্ধ রেখেছিল কিন্তু ব্রিটিশরা ব্রহ্মদেশ থাইল্যান্ড প্রভৃতি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া উপমহাদেশের মূল ভূখণ্ড (mainland states) অঞ্চলগুলির সঙ্গে দ্বীপ অঞ্চল (meritime states)-গুলিতেও ঔপনিবেশিক অনুপ্রবেশ করে এবং ভৌমিক (territorial) আর্থিক আগ্রাসন সম্পূর্ণ করে। ঔপনিবেশিক যুগে এই বৈশিষ্ট্য সর্বত্রই পরিলক্ষিত হয়। ঔপনিবেশিক যুগে বিভিন্ন পশ্চিমী শক্তির দ্বন্দ্বের পরিচয় পাওয়া যায়। একইভাবে মালয়ী রাষ্ট্রেও ডাচ-ব্রিটিশ সংঘর্ষও ঘটল। ১৮২৪ সালে দেখা গেল চুক্তির মাধ্যমে দুটি শক্তি নিজ প্রভাবাধীন অঞ্চলে ব্রিটিশরা মালয়ে এবং ডাচরা ইন্দোনেশিয়াতে প্রতিষ্ঠিত হ'ল।

৬৬.২ ইঙ্গো-ব্রহ্ম বিরোধিতার কারণ

অষ্টাদশ শতকে ব্রহ্মের শাসক সম্প্রদায় বিশ্বাস করতেন যে আসাম, মণিপুর এবং আরাকান প্রভৃতি অঞ্চল নিয়ে বর্মায় পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ গঠিত এবং এখানে বর্মী প্রশাসন বজায় থাকবে। অথচ প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে যে ন্যূনতম স্বাভাবিক পদক্ষেপ গৃহীত হওয়া প্রয়োজন তাও নেওয়া হয়নি। শুধু রাজতন্ত্রের পক্ষ থেকে এটা আশা করা হত যে এই প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলিতে আবশ্যিকভাবে রাজকীয় কর্তৃত্ব দৃঢ়ভাবে বজায় থাকবে।

অন্যদিকে ভারতবর্ষে এই সময়ে অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে ব্রিটিশ আধিপত্য প্রসারিত হচ্ছিল কাজেই কোন এক সময়ে ইন্দো-ব্রহ্ম পরস্পরের প্রান্তসীমা স্পর্শ করবে এতো স্বাভাবিক। বর্মার এই প্রত্যন্ত আঞ্চলিক সীমা যে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ অস্বীকার করতে পারে এটাও বর্মার রাজতন্ত্রের পক্ষ থেকে ভাবা হয়নি। এই প্রান্তসীমায় বর্মা

ও ভারত উভয়ের ভূখণ্ড সামিল ছিল। ব্রিটিশ বণিক সম্প্রদায়ের স্বার্থ যে মুহূর্তে ক্ষুণ্ণ হবে তখনও যে সংকট সৃষ্টি হবে এটা অনিবার্য। তাই খুব ধীরে হলেও অবশ্যম্ভাবীভাবে ব্রিটিশ-ব্রহ্ম সম্পর্ক ক্ষতিগ্রস্ত হতে লাগল।

যদিও প্রথমদিকে এই সীমান্ত সমস্যা একটা সমাধান বন্ধুত্বপূর্ণ উপায়ে করা হয়েছিল। কিন্তু ব্রহ্মের রাজাদের মধ্যে রাজকীয় অহঙ্কার ও গর্বের এবং বোধ পতন ডেকে আনল। কারণ self-glorification ছিল তাদের আগ্রাসী মানসিকতার মূল কেন্দ্র। ব্রহ্মের রাজতন্ত্রের মধ্যে অহমিকা বোধের সঙ্গে সংঘর্ষ লেগেছিল ব্রিটিশ বণিক সম্প্রদায়ের স্বার্থের। এই শ্রেণী কোনভাবেই নিজ বাণিজ্যিক স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হোক চায়নি আবার এটাও চায়নি অন্য কোন বণিজ্যগোষ্ঠী ব্রহ্মের বাণিজ্যে ভাগ বসাক। তাদের ভীতি, তাদের আশংকা, স্বার্থ প্রভৃতি মিলেমশে এমন এক জটিল অবস্থার সৃষ্টি করল যা শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ সরকারকে বাধ্য করল ব্রহ্মদেশের সংযুক্তিকরণে।

৬৬.৩ বর্মার সমাজব্যবস্থা ও বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী

বর্মায় বিদ্যমান ছিল বহুজাতিভিত্তিক সমাজব্যবস্থা। বহু জাতি উপজাতি দ্বন্দ্বে জর্জরিত ছিল ব্রহ্মদেশ। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য দুটি জাতিগোষ্ঠী ছিল শান ও মোন। এদের অন্তর্কলহ প্রায়শই ব্রহ্মদেশকে ব্যতিব্যস্ত করে রাখত। এই মোন উপজাতির অনেক অবদান ব্রহ্মের সমাজব্যবস্থায় পরিলক্ষিত হয়। মোন লিপি ছিল বর্মী লিপিমালার আধার। মোন শিল্পী ও স্থপয়তিরা বর্মার বহু ধর্মমন্দির স্তূপ নির্মাণ করেছিল। এছাড়া বর্মার বহির্বাণিজ্য এই মোন জাতিই পরিচালনা করত। বর্মার সংস্কৃতির অগ্রদূত ছিল এই মনে জাতি। এদের আদি বাসভূমি ছিল দক্ষিণ বর্মার পেগুতে ও শান গোষ্ঠী ছিল থাই জাতিভুক্ত যারা থাকত উত্তর-পূর্ব বর্মায়। এই উত্তর ও দক্ষিণাংশের প্রতিদ্বন্দ্বিতাই ছিল বর্মার ইতিহাসের মূল ঘটনা। এদের পুঞ্জীভূত অসন্তোষ বার বার বর্মার রাজতন্ত্রকে হস্তক্ষেপে বাধ্য করত। রাজতন্ত্রের মধ্যে জাতিগোষ্ঠীকে একত্রিত করে রাখার একটা প্রবণতা দেখা যায়।

৬৬.৩.১ বর্মী রাজতন্ত্রের উপর এই জাতিগোষ্ঠীর প্রভাব

শান ও মোন ছাড়া বর্মন নামেও এক জাতিগোষ্ঠী ছিল যারা মোনদের সঙ্গে বিরোধীভাবাপন্ন ছিল। ১২৮৭ সালে মোঙ্গল আক্রমণে ইরাবতী নদীতীরে বর্মার প্রাচীন রাজধানী ‘পাগান’-এর পতন হলে এই বর্মনগোষ্ঠী খুব ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল তথা রাজনৈতিক ভাবেও বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। টৌঙ্গু রাজবংশের সময় (১৫৩১-১৭৩২) তারা পুনরায় ঐক্যবদ্ধ হয়। টৌঙ্গু বংশের পতনের পর দুই দশক তারা রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা কাটিয়ে বর্মায় শেষ রাজবংশ কুনবঙ রাজতন্ত্রের উত্থানের সঙ্গে নিজেদের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে। টৌঙ্গু রাজতন্ত্রের সময়ে বর্মন ও মোনরা একত্রিত হয়ে প্রশাসন পরিচালনা করে। কারণ টৌঙ্গু রাজতন্ত্র সামাজিক উন্নয়নে এবং পুনঃ ঐক্যকরণে মোন জাতির সহায়তাকে স্বীকার করেছিলেন। তাঁর (Tabinshweti—Tongu King) উদ্দেশ্য ছিল প্রশাসনিক ক্ষেত্রে বর্মন ও মোন জাতির সম্মিলিত সহায়তা।

টোঙ্গু রাজতন্ত্রের আমলে কয়েকবার থাইল্যান্ডের সঙ্গে যুদ্ধ পরিচালনা করা হয়। প্রথম দিকের কিছু যুদ্ধে থাইল্যান্ড পরাজিত হলেও ষোড়শ শতকের শেষভাগে থাইল্যান্ড দক্ষিণ বর্মার বন্দর মৌলমিয়েন অধিকার করে। এই সময়ে শান ও মোন বিদ্রোহ সংঘটিত হয়।

সপ্তদশ শতকে দুটি বিবাদমান রাষ্ট্রের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হয়। উভয় রাষ্ট্র সংহতি ও শান্তির প্রতি মনোনিবেশ করে। এই সময়েই উভয় রাষ্ট্রে বিদেশী বণিকদের পদধ্বনি শোনা যায়। ব্রিটিশ, ফরাসী ওলন্দাজদের বাণিজ্যতরী একের পর এক এখানকার বন্দরে ভিড় জমাতে থাকে।

সপ্তদশ শতকে ব্রহ্মের রাজধানী উত্তর ব্রহ্মের আভায় (Ava) স্থানান্তরিত হয়েছিল। আপনারা আগেই জেনেছেন টোঙ্গু রাজতন্ত্র মোন জাতিগোষ্ঠীর সহযোগিতা নিয়েছিল। রাজতন্ত্রের পৃষ্ঠপোষকতায় মোন জাতিও আধিপত্য বিস্তার করেছিল টোঙ্গু রাজতন্ত্রে। ১৭৫২ সালে মোন বিরোধী বর্মনরা নতুন নেতা আলংপায়ার নেতৃত্বে সঙ্ঘবদ্ধ হয় যিনি মোন আধিপত্য স্বীকার করতে প্রস্তুত ছিলেন না। আলংপায়ার মোন বিরোধিতা বর্মনদের উৎসাহিত করে এবং তারা আলংপায়ার সঙ্গে সমবেত হন। এইভাবে আলংপায়ার অধীনে এক বিশাল সংখ্যার সামরিক বাহিনী তৈরি হয়। তিন বছরে মধ্যে তনি মধ্যবর্মা, পেগু ও দাগন অধিকার করেন। আলংপায়া দাগন অঞ্চলটির নাম পরিবর্তন করে রাখেন রেঙ্গুন অর্থাৎ যুদ্ধের শেষ Rangoon (end of war)।

এখানে আপনাদের একটি তথ্য জানা দরকার যে পাগান-এর পতনের পর মোনরা নিজেদের স্বাধীন বলে ঘোষণা করে। মোন জাতি তাদের সমাজকে অনেক নেতা উপহার দিয়েছিল। আপনারা আগেই জেনেছেন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে সমাজব্যবস্থায় নারীর স্থান ছিল অনেক ঊর্ধ্বে। মোন নেত্রী সিন সোবু (Shin Sowbu 1453-1472) ছিলেন বর্মার একমাত্র রানী। তাঁর আদেশানুসারে দাগন গ্রামের সিউ দাগন প্যাগোডার সংস্কার হয়। রানী তাঁর ওজনের সমপরিমাণ সোনা দান করেছিলেন এই ৩০২ ফুট উচ্চ প্যাগোডার শীর্ষভাগ তথা চূড়াটিকে সোনার পাতে মুড়ে দেবার জন্য। পরবর্তীকালে ব্রহ্মরাজ মিন্দন-এর সময়ে অর্থাৎ ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগে এই প্যাগোডার চূড়ায় একটি রত্নখচিত ছাতা স্থাপন করা হয়।

৬৬.৩.২ ব্রহ্মের কুনবঙ রাজতন্ত্র ও ব্রিটিশ হস্তক্ষেপ

সুতরাং আলংপায়ার নেতৃত্ব বর্মনদের সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠিত হয় কুনবঙ রাজতন্ত্র। তাঁর সময়ে মোন জাতির সঙ্গে যে সংঘর্ষ উপস্থাপিত হল তাতে অধিকৃত হল দাগন যা পরে রেঙ্গুন নামে পরিচিত হল। এই সময়ে কনবঙ (Konbaung) রাজতন্ত্র ও মোনজাতির আভ্যন্তরীণ সংঘর্ষের সুযোগে ১৭৫৩ সালে ব্রিটিশরা বা ব্রিটিশ-পূর্ব ভারত কোম্পানি (British East Company) দখল করে নেয় বর্মার একটি দ্বীপঅঞ্চল নেগ্রাইস (Negrais)।

বঙ্গোপসাগরে ফরাসি কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করা এবং বর্মী বণিজ্যভাণ্ডার দখল করার উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশদের। এখানে ইরাবতী নদীপথে বর্মার বণিজ্যিক পণ্য রাখা হত। তাই এই দ্বীপটি ছিল ব্রিটিশদের কাছে সামরিক ও অর্থনৈতিক কারণে গুরুত্বপূর্ণ।

আলংপায়া প্রথমে নম্রভাবে একটি পত্রে ব্রিটিশরাজ দ্বিতীয় জর্জকে ব্রিটিশ অনাধিকার প্রবেশ সম্পর্কে জানিয়ে কোন প্রত্যুত্তর পেলেন না। তখন তিনি একটি খবর পান যে ব্রিটিশরা মোন গোষ্ঠীকে রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে গৃহযুদ্ধে উৎসাহিত করছে, এই খবর তিনি মোন যুদ্ধবন্দীদের কাছ থেকেই পেয়েছিলেন। এই অবস্থায় আলংপায়া নেগ্রাইস দ্বীপে অধিষ্ঠিত ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির লোকজনের উপর হামলা করতে বর্মী সামরিক বাহিনীকে আদেশ দেন।

ইংরেজরা এই সময়ে ভারতবর্ষে ফরাসিদের ক্ষমতার দ্বন্দ্বে লিপ্ত ছিল বলে এখানে বেশি সময় ব্যয় না করে প্রায় তিনদশকের জন্য বর্মাকে ছেড়ে চলে যায়। এই শতাব্দীর শেষভাগে চীনের সঙ্গে ব্রিটিশ বাণিজ্যিক সম্পর্ক বৃদ্ধি পাচ্ছিল। ১৭৯৫ সালে ব্রিটিশ বাণিজ্য মিশন বর্মায় উপস্থিত হয়। ক্যাপ্টেন মাইকেল সিমসের (Captain Michael Symes) নেতৃত্ব এই মিশনের উদ্দেশ্য ছিল বর্মার মধ্যে ব্রিটিশ ও চীনের বাণিজ্য পরিচালনা করা। তবে প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল বর্মায় কোন ফরাসি কার্যকলাপ-এর অস্তিত্ব আছে কিনা তা পরীক্ষা করা। ঊনবিংশ শতকের প্রথমে সিমস দ্বিতীয়বার বর্মায় আসেন এবং রিপোর্টে বলেন বর্মার ও চীনের তুলো যদি ব্রিটেনে পাঠানো যায় তবে তা ব্রিটিশ বস্ত্রশিল্পের খুবই সহায়ক হবে। কিন্তু মূল বিষয়টি ছিল অনেক গভীরে। বর্মাকে ফরাসি প্রভাবমুক্ত রাখার উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশদের। বর্মার বাণিজ্য নিয়ে তাদের আগ্রহ ছিল না। তাদের উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় রাজাদের সমপর্যায়ে ব্রহ্মের রাজাকে আওতাভুক্ত করা। ভারতীয় রাজন্যবর্গ যেমন ব্রিটিশ আধিপত্য স্বীকার করে নিয়েছে এবং ভারতে ব্রিটেনের সার্বভৌম ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং ফরাসি আধিপত্য বিলুপ্ত হয়েছে। ব্রহ্মেও তেমন চিত্র তাঁরা দেখতে চেয়েছিলেন।

৬৬.৩.৩ প্রথম ইঙ্গো-ব্রহ্ম যুদ্ধের কারণ

বাস্তবিক পক্ষে সমগ্র ঊনবিংশ শতকে একটি প্রশ্নে ইঙ্গো-ব্রহ্ম সংঘর্ষ চলতে থাকে তা হল চূড়ান্ত কর্তৃত্বের অধিকারী কে হবে? ব্রিটিশ না বর্মী রাজতন্ত্র? ব্রিটিশরা যেমন ভারতীয় রাজাদের নিজ অধীন করে ফেলেছে সেই স্তরে বর্মী রাজাকে নামাতে বা নামিয়ে আনতে বদ্ধপরিকর হয়ে ওঠে তেমনভাবে বর্মী রাজতন্ত্রও নিজ সার্বভৌমত্ব রক্ষাকল্পে যাবতীয় উপায়ের অবলম্বন করলেন ফলে সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে উঠল।

আলংপায়ার আট বছরের দীর্ঘ সময়কালে মোনদের বিরুদ্ধে এবং আরাকান, মণিপুর, শানরাজ্য প্রভৃতি অঞ্চলে অনেক যুদ্ধাভিযান হয়। তাঁর সুযোগ্য পুত্র বোদাপায়ায় সময় শ্যাম দেশে শক্তিশালী চক্রী রাজবংশের উত্থানের পর বর্মার যুদ্ধাভিযানের দিক পরিবর্তিত হয়। বর্মা পুর্বদিকের পরিবর্তে পশ্চিমদিকে তথা ভারত অভিযানে মন

দেন একই সঙ্গে রাজ্যিক প্রশাসনে কোনবঙ রাজতন্ত্র সচেষ্ট হয়। সীমান্তে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারীরা বর্মী নিয়মের লঙঘন করছে এই যুক্তিতে বোদাপায়া আসামকে সংযুক্ত করার জন্য অভিযান পরিচালনা করলেন। মণিপুররাজ ১৮১৯ সালে নিজেকে স্বাধীন বলে ঘোষণা করেন এবং বোদাপায়ার রাজ্যভিষেকে উপস্থিত হতে অস্বীকার করেন। এবার বর্মী রাজতন্ত্রের এই প্রসারণে ভীত হয়ে তিনি কাছাড় অঞ্চলে পালিয়ে যান। এই কাছাড় ছিল ব্রিটিশ দ্বারা সুরক্ষিত অঞ্চল।

ইতিপূর্বে নেপোলিয়ানে যুদ্ধ, মারাঠা, মহীশূর ও ফরাসিদের সঙ্গে ক্ষমতার দ্বন্দ্বের কারণে ব্রিটেন বর্মার কার্যকারিতার ব্যাপারে মন দেয়নি। কিন্তু ১৮১৫-র পর ব্রিটেন সামুদ্রিক শক্তি হিসাবে অপ্রতিদ্বন্দ্বি হয়ে ওঠে এবং ১৮১৮ সালের মধ্যে সমগ্র ভারতবর্ষের একমাত্র রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত প্রদেশের বর্মী আক্রমণ তথা প্রসারণকে প্রতিহত করতে উদ্যত হ'ল।

৬৬.৩.৪ যুদ্ধের ফলাফল

১৮২৪ সালের মার্চ মাসে সংঘটিত হ'ল প্রথম ইঙ্গো-ব্রহ্ম যুদ্ধ। যুদ্ধে ব্রিটিশ দ্বারা রেঙ্গুন অধিকৃত হয় এবং বর্মা আসাম ও মণিপুরের ওপর অধিকার ত্যাগ করে এবং ভারতস্থিত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাছে ব্রহ্ম উপকূলবর্তী অঞ্চল, তেনাসেরিম ও আরাকান ছেড়ে দেয়। রাজধানী আভা থেকে পঞ্চাশ মাইল ভিতরে ইয়ান্দবু নামক স্থানে স্বাক্ষরিত চুক্তিতে বর্মা থাইল্যান্ড বা শ্যামে সঙ্গে যুদ্ধ পরিচালনা করবে না বলে স্বীকৃত হয়। এছাড়া এক মিলিয়ান পাউন্ড যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ দেয়। বর্মার রাজধানীতে একজন ব্রিটিশ রেসিডেন্ট রাখতে স্বীকৃত হয়।

ব্রিটেন এইভাবে বর্মার সঙ্গে রাজনৈতিক গোলোযোগের মাধ্যমে প্রথম পর্যায়ের আধিপত্য স্থাপন করে। ভারতস্থিত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এর পর বর্মায় বাণিজ্যিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় কার্যকরী পদক্ষেপ নিল। যদিও সরকারি চিঠিপত্রে দেখা যায় যে তেনাসেমি ও আরাকান অঞ্চল ব্রহ্ম রাজতন্ত্রকে প্রত্যার্পণে কথা ছিল সেই শর্তে যখন ব্রহ্মরাজ যুদ্ধ ক্ষতিপূরণের অর্থ পুরো দেওয়া হয়ে যাবে। অথচ ১৮৩০ সালের মধ্যে দেখা গেল এই আরাকানে উৎপন্ন হল প্রচুর ধান। এবার বর্মার বনজসম্পদ বিশেষ করে সেগুন কাঠ ও চাল রপ্তানির জন্যে নির্মিত হল বন্দর। তেনাসেরিমে মৌলমিয়েন প্রতিষ্ঠিত বন্দরটি ব্রিটিশ বাণিজ্যিক কাজকর্ম পরিচালিত করত। তাই ব্রিটিশদের পক্ষে আরাকান এবং তেনাসেরিম পুনরায় ব্রহ্ম রাজতন্ত্রকে ফেরৎ দেওয়া একান্তই কঠিন হয়ে উঠল। অথচ ব্রহ্মরাজ বোদাপায়া খুবই ধৈর্য্য ও নম্রতার সঙ্গে প্রতীক্ষা করছিলেন এই দুটি অঞ্চলের উপর কর্তৃত্ব পুনরায় ফিরে পাবার জন্য অথচ ইংরেজদের পক্ষ থেকে প্রতিশ্রুতি পালনের কোন প্রয়াস পরিলক্ষিত হ'ল না। এইসময়ে বোদাপায়ার বিরুদ্ধে প্রাসাদের অভ্যন্তরে ষড়যন্ত্রের সৃষ্টি হ'ল। ভ্রাতা থারওয়াদির নেতৃত্বে একটি বিপ্লব ঘটে এবং ১৮৩৭ সালে বোদাপায়া সিংহাসনচ্যুত হন।

৬৬.৪ দ্বিতীয় ইঙ্গো-ব্রহ্ম যুদ্ধ

ইতিমধ্যে বর্মাকে চীনের সঙ্গে বাণিজ্য করার ক্ষেত্র হিসাবে ব্যবহার করার চেষ্টা চলতে থাকে। কারণ চীনের বিপুল জনসংখ্যা ইংল্যান্ডের ম্যাঞ্চেস্টার, ল্যাঙ্কাশায়ার, ইয়র্কশায়ারের উৎপাদিত বস্ত্রের বিক্রির জন্য এক সম্ভাবনাময় বাজার সৃষ্টি করেছিল। নানকিং চুক্তিতে চীনের পাঁচটি বন্দরের উপর ব্রিটেন অধিকার লাভ করে পশ্চিমী বাণিজ্য পণ্য রপ্তানির রাস্তাও পেয়ে যায়। এখন প্রথম ইঙ্গো-ব্রহ্ম যুদ্ধের পর বর্মাকে চীনের এই বিশাল বাজারে পৌঁছবার একটা পিছনের দরজা হিসাবে ব্যবহার করতে ব্রিটেন প্রয়াসী হল। জন ক্রাফোর্ড এই ব্যাপারে একটা প্রতিবেদন প্রস্তুত করলেন এবং বর্মার সঙ্গে বাণিজ্যিক ব্যাপারে সম্ভাবনার দিকটি তুলে ধরলেন। বর্মা ও চীনের তুলো রপ্তানি করে ইংল্যান্ড থেকে প্রস্তুতপণ্যের বাজার তৈরি হবে এবং তার লভ্যাংশের সম্ভাবনায় ব্রিটিশ বণিক, প্রশাসনিক গোষ্ঠীও উৎসাহিত হয়ে ওঠে।

এই কার্যের প্রারম্ভে প্রয়োজন ছিল বর্মার রাজনীতি ও প্রশাসনিক স্তরে সহায়তার। ইয়ান্দাবু সন্ধির পর ব্রিটিশরা বর্মার অনেকগুলি বাণিজ্যপথ ব্যবহার করছিল যেমন বর্মার চুনী, পান্না প্রভৃতি বহুমূল্য মণি, রত্ন, পাথর প্রভৃতি আসাম-আভা পথে(কাঠ প্রভৃতি বনসম্পদ আরাকান-কলকাতা পথে(তুলো, রৌপ্য, সোনা গবাদি পশু, ঘোড়া প্রভৃতি মৌলমিয়েন-আভা পথে শান রাজ্য হয়ে(আদান-প্রদান চলত। সন্ধিপত্রে এই পথ ব্যবহারের কথা কিছু বলা হয়নি। অথচ ব্রিটিশ কর্তৃক তাই হচ্ছিল। এবার পুনরায় কোন বাণিজ্যিক পথের কথা হলে হয়ত বর্মী রাজতন্ত্র, উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা বিরোধিতা না করে প্রস্তাবটি স্থগিত করে দেবেন। এই রকম ভাবনাই করেছিলেন বর্মাস্থিত ব্রিটিশ রেসিডেন্ট মেজর হেনরী বার্নে (Major Henry Burney 1830-1837)। ব্রহ্মরাজ থারওয়াদি ইয়ান্দাবু সন্ধির অসম্মানজনক শর্তগুলি নাকচ করতে উদ্যত হলেন। ব্রিটিশ সকারের কাছে এই সময়ে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত সমস্যার তথা ইন্দো-আফগান সম্পর্কের সমস্যা সমাধান একান্ত জরুরী ছিল এবং ১৮৪০ সালে ব্রিটিশ রেসিডেন্সি রেঙ্গুন থেকে স্থানান্তরিত করে নেওয়া হলে পরবর্তীকালে উভয় শক্তির মধ্যে শান্তিপূর্ণ আলোচনার পথটি রুদ্ধ হয়ে যায়।

৬৬.৪.১ দ্বিতীয় ইঙ্গো-ব্রহ্ম যুদ্ধ ও ফলশ্রুতি

থারওয়াদির পর তাঁর পুত্র পাগান মিনের সময়কালে শুধু ইঙ্গো-ব্রহ্ম সম্পর্কই নয় সরকারি বাণিজ্য, রাজ-কর্মচারীদের সঙ্গে সম্পর্কেরও অবনতি ঘটে এবং সংঘটিত হয় দ্বিতীয় ইঙ্গো-ব্রহ্ম যুদ্ধ। ১৮৫২ সালে সংঘটিত দ্বিতীয় যুদ্ধ কোন সাধারণ সীমান্ত সমস্যার ফলশ্রুতি ছিল না। দ্বিতীয় যুদ্ধ বাণিজ্যিক কারণেই সংঘঠিত হ'ল ১৮৪০ সালের পর রেঙ্গুন বর্মার অন্যতম বাণিজ্য কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। ব্রিটিশরা এখান থেকে তুলোজাত দ্রব্য এবং কাঠের রপ্তানি করত একই সঙ্গে বুলিয়ান (সোনা বা রূপার বাট বা পিন্ড) রপ্তানি হত। বুলিয়ানের রপ্তানির বিষয়টি ইয়ান্দাবু সন্ধিতে নিষিদ্ধ হয়। বর্মা থেকে মূল্যবান ধাতু, মশলার নির্গমন রোধ করার জন্য সরকারি পক্ষ থেকে

তল্লাশি শুরু হলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারীর কাছে বর্মাস্থিত ব্রিটিশরা অভিযোগ জানাতে থাকে। কখনোও বা এই বর্মা সরকারের তল্লাশিমূলক কাজকে উদ্ধত, নিষ্ঠুর বলে অভিহিত করা হতে থাকে। বর্মা সরকার ইংরেজ বণিকদের সঙ্গে দ্বন্দ্বের দ্বিতীয় কারণটি ছিল সেগুন কাঠ নিয়ে। কাঠ ব্যবসায়ী অর্থ বিনিয়োগের নতুন লাভজনক ক্ষেত্র খুঁজছিলেন। ১৮৪১ সালে সরকারি পক্ষ থেকে কাঠের অপচয় ও অনাবশ্যক গাছকাটা নিষিদ্ধ হয় এবং বর্মার বনজসম্পদের রাজকীয় আধিপত্যের কথা বলা হয়। যা ব্রিটিশ বণিকদের রুষ্ট করে এইসব বণিকরা সিঙ্গাপুরের সঙ্গে অবাধ বাণিজ্যের পক্ষে ছিল তাই বর্মার সরকারের পক্ষ থেকে এই ধরনের বিধিনিষেধ স্বাভাবিকভাবে তাদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি করেছিল। অথচ ঐতিহ্যগতভাবে ব্রহ্মরাজ তাঁর রাষ্ট্রের যাবতীয় বাণিজ্যের প্রধান ছিলেন এবং যে কোন সম্পদকে তাঁর একাধিপত্যে নিয়ে আসাটা খুবই স্বাভাবিক ছিল।

ইতিমধ্যে বাণিজ্যিক বন্দর হিসাবে রেঙ্গুন খুবই প্রসারিত হয়েছিল ও ব্রিটিশ বণিকরা ভারত সরকারকে চাপ দিচ্ছিলেন যাতে দক্ষিণ ব্রহ্ম সরাসরিভাবে ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। মৌলমিয়েনের কমিশনের অফিসে একের পর এক অভিযোগ পত্র এই ব্যাপারে জমা হতে থাকে। প্রকৃতপক্ষে বাণিজ্যিক স্বার্থকে প্রতিবন্ধকতা মুক্ত করতে যুদ্ধ ঘটানো ছাড়া অন্য কোন উপায় ছিল না।

ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনী দ্রুতগতিতে রেঙ্গুন দখল করে টোংগু পর্যন্ত দক্ষিণ বর্মা অধিকার করল। ব্রহ্মরাজের অপেক্ষা না করেই উত্তর ও দক্ষিণ ব্রহ্মের সীমানা নির্দিষ্ট করা হল। এইভাবে মারতাবান (Martaban), রেঙ্গুন, বেসিন ও পেগু, প্রোম সহ সম্পূর্ণ দক্ষিণ ব্রহ্ম ব্রিটিশ আওতায় চলে। ব্রহ্মের ক্ষেত্রে আপনারা দেখলেন বাণিজ্যিক বিষয়টি কতখানি শক্তিশালী ভূমিকা পালন করতে পারে। অন্তত দ্বিতীয় ইঙ্গো-ব্রহ্ম যুদ্ধের ফলে ব্রিটিশদের রাজ্যিক প্রসারণ তা প্রমাণ করে।

৬৬.৪.২ ব্রহ্মরাজা মিন্দন ও ইঙ্গো-ব্রহ্ম সম্পর্ক

এই ব্রহ্মের রাজপ্রাসাদে পাগান মিন ও তাঁর সমর্থকদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ঘনিয়ে উঠেছিল। পেগুর ব্রিটিশ কমিশনার এই পরিস্থিতিতে বিরুদ্ধ দলের নেতা ও পরবর্তীকালে ব্রহ্মরাজ মিন্দন মিনের সঙ্গে চুক্তি করে ইংরেজ অধিকৃত বর্মার সীমানা টোংগু প্রদেশ থেকে বাড়িয়ে আরো পঞ্চাশ মাইল ভিতরে করে নিলেন। এই অঞ্চলের আওতাভুক্ত একটি বিশাল সেগুন গাছের জঙ্গলও অধিকৃত হল। ব্রিটিশ নৌ-বাহিনীতে বর্মা টিকে আর সেগুন কাঠের খুব কদর ছিল এবং টোংগু প্রদেশের এই বনভূমির প্রতি ব্রিটিশ বণিকরাও অনেকদিন ধরে লোভাতুর দৃষ্টি দিচ্ছিল।

দ্বিতীয় ইঙ্গো-ব্রহ্ম যুদ্ধের (১৮৫২) পর পাগান মিনের স্থানে রাজা হলেন তাঁর ভ্রাতা মিন্দনমিন। মিন্দন ব্রিটিশদের সঙ্গে সর্বদা বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার করেছিলেন। তবে তাঁর বর্মার রাজতান্ত্রিক অধিকারভুক্ত অঞ্চলের সীমানা অনেক ছোট হয়ে যায়। সমুদ্র উপকূলভাগ, সমৃদ্ধ সেগুন কাঠের বনবূমি ও ধান উৎপাদনের বিখ্যাত রাজ্যাংশ তিনি ব্রিটিশদের কাছে ছেড়ে দেন। বণিকদের অনেক অর্থনৈতিক সুবিধাদান করেন।

মিন্দর তাঁর রাজত্বকালে (১৮৫৩-১৮৭৮) বর্মাকে স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে স্বীকৃতিদানের জন্য কূটনৈতিক মিশর প্রেরণ করেছিলেন। তাঁর মুখ্যমন্ত্রী আন্তর্জাতিক স্তরে বর্মার হৃত অঞ্চল পুনরুদ্ধারের জন্য লন্ডন, রোম ও প্যারিস ভ্রমণ করেন। মিন্দন তাঁর রাজত্বকালে নতুন রাজধানী মান্দালয় নির্মাণ করেন। রাজধানী অমরাপুরার পরিবর্তে মান্দালয় তাঁর আমলে বৌদ্ধ সংস্কৃতি ও ধর্মের কেন্দ্র হয়ে ওঠে। তিনি অনেকগুলি প্রশাসনিক সংস্কার সাধন করেন। সংস্কারগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল উর্বরতা অনুসারে ভূমিরাজস্ব নির্ধারণ, সরকারি কর্মচারীদের স্থায়ী বেতন, ওজন ও পরিমাণ নির্ধারণ, টেলিগ্রাফ ব্যবস্থার প্রচলন, নতুন সড়ক নির্মাণ প্রভৃতি। এছাড়া বর্মী রাজাদের মধ্যে তিনি প্রথম মুদ্রা প্রচলন করেন। তাঁর রাজত্বকালকে শ্যামদেশের চক্রী রাজবংশের মোঙ্গকূট-এর (Mongkut) শাসনকালের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। যদিও শ্যাম দেশ বা থাইল্যান্ড ব্রিটিশ ফরাসিদের মাঝখানে Buffer বা যুদ্ধহীন অঞ্চল হিসাবে স্বাধীনতা বজায় রাখতে পেরেছিল সেখানে স্বাধীন বর্মার উপস্থিতি ব্রিটিশ বাণিজ্যিক স্বার্থের পক্ষে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এখানে আপনাদের একটি তথ্য জানা দরকার যে সামরিক ও রণকৌশল এবং নীতি নির্ধারণের জন্য ব্রহ্মের রাজধানী ছয় বার স্থানান্তরিত হয়েছিল প্রথমে পাগান থেকে সেবুতে(দ্বিতীয় ও চতুর্থ বারে আভায়(তৃতীয় ও পঞ্চমবারে অমরাপুরায় এবং শেষবারের মতো মান্দালয়ে রাজধানী স্থানান্তরিত হয়।

৬৬.৫ তৃতীয় ইঙ্গো-ব্রহ্ম যুদ্ধের ফলাফল

১৮৭৮ সালে মিন্দন মিনের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র থিবো বর্মার সিংহাসনে বসেন। তিনিই ছিলেন বর্মার শেষ রাজা। তাঁর সময়ে সংঘটিত হল তৃতীয় ইঙ্গো-ব্রহ্ম যুদ্ধ এবং যুদ্ধের পর সমগ্র উত্তর ব্রহ্ম ব্রিটিশ অধিকারভুক্ত হয়। এইভাবে তিনটি যুদ্ধের দ্বারা স্বাধীন ব্রহ্মদেশ তার অস্তিত্ব ব্রিটিশ বাণিজ্যিক স্বার্থের কাছে হারিয়ে ফেলে।

ব্রহ্মরাজ থিবো সিংহাসনে আরোহণ করেই তাঁর বিরোধীদের নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেন। ব্রিটিশ রেসিডেন্ট এর প্রতিবাদ করেন। তিবোর সঙ্গে প্রথম থেকেই ব্রিটিশ সরকারে সম্পর্ক তিক্ত হয়ে ওঠে। থিবো ও তাঁর পত্নীর নেতৃত্বে রাজপ্রাসাদে এক ব্রিটিশ বিরোধী দলের সৃষ্টি হয় যারা ব্রিটিশ বণিকদের প্রতি অনেকটা কঠোর নীতি অনুসরণের পক্ষপাতী ছিলেন। এই সময় ভারতবর্ষের সিমলাতে ব্রহ্ম ও ব্রিটিশ প্রতিনিধির মধ্যে আলোচনা স্থগিত করে দেওয়া হয় এবং রাজতন্ত্রের পক্ষ থেকে রাজা সার্বভৌম ও একচেটিয়া অধিকারের কথা ঘোষণা করা হলে পুনরায় সেই পুরাতন প্রশ্নটি মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। ব্রহ্মে কার চূড়ান্ত কর্তৃত্ব স্থাপিত হবে বর্মী রাজতন্ত্রে নাকি ব্রিটেনের। ফলে ইঙ্গো-ব্রহ্ম সম্পর্কের অবনতি হয়।

এই সময় থিবো ব্রহ্মরাজ্যে ব্রিটিশ হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা একেবারে দূর করার জন্য ফরাসিদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ

সম্পর্ক স্থাপনে উদ্যোগী হন। ইতিমধ্যে শ্যামদেশ বা ইন্দোচীনে ফরাসি অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ফরাসি শক্তি(বর্মায় প্রভাব বিস্তার বাণিজ্যের অনুপ্রবেশ করতে আগ্রহ প্রকাশ করতে থাকে।

১৮৮২ থেকে ১৮৮৪ সাল পর্যন্ত এই দুবছর কিছু কিছু ঘটনা কিছু অপপ্রচার মিলেমিশে ব্রিটিশ বর্মা সম্পর্কের এমন অবনতি ঘটায় যে ১৮৮৬ সালে সমগ্র উত্তর ব্রহ্ম ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত(হয়ে যায়। এই সময়ে ব্রিটিশ সরকারে (স জাতি আফগানিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক নির্ণয়ে বাধ্য করেছিল। ১৮৮০-র দশকে বর্মায় সম্ভাব্য ফরাসি নিয়ন্ত্রণের ভাবনা ব্রিটেনকে এক দুর্ভাবনাগ্রস্ত করে রেখেছিল। ব্রিটিশ বণিকরা এখানকার কাঠ, তেল, তুলো, মূল্যবান পাথর, টিন প্রভৃতি বাণিজ্যিক ক্ষেত্রগুলিতে অর্থ বিনিয়োগ করে রেখেছিল। এই অবস্থায় বর্মার অন্তর্ভুক্তি(করণ একান্ত আবশ্যক হয়ে পড়ে।

৬৬.৫.১ থিবো ও ব্রহ্ম ফরাসি সম্পর্ক

১৮৮৫ সালে ফরাসি সরকার ও ব্রহ্মরাজ থিবোর সঙ্গে বাণিজ্যিক চুক্তি(সম্পন্ন হয়। ব্রহ্মরাজ রাজধানী মান্দালয়ে ফরাসি কনসুলেট স্থাপনের অনুমতি দেন। বর্মায় ব্যাপক ফরাসি অনুপ্রবেশ ব্রিটিশ বণিকদের আশঙ্কার কারণ হয়ে দাঁড়াল। ব্রহ্মে যে সব স্থানে ব্রিটিশ আধিপত্য আছে তা ফরাসিদের হস্তান্তরিত হবার ভীতি দেখা গেল। এই ভীতির ফলে অপ্রচার হতে লাগল যে মান্দালয়ে বর্মা ও ফ্রান্সের যৌথ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা হবে(রাজকীয় খনি (বিশেষ করে চুনীর খনি)-গুলি গচ্ছিত থাকবে ফরাসিদের কাছে(ডাক, তারও টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হবে ফরাসি দ্বারা(মান্দালয় ও টংকিনের মধ্যে রেলপথ স্থাপিত হয়ে ফরাসি ইন্দোচীন থেকে অস্ত্র উত্তর ব্রহ্মে আসবে(ভূগর্ভস্থ তেল, কাঠ, যাতায়াত, ইরাবতী নদীর ফেরী ব্যবস্থা—ইত্যাদি সর্বত্র ফরাসি আধিপত্য প্রতিষ্ঠা হবে। ব্রিটিশ বণিক সম্প্রদায়ের এই ভীতির ফলে শেষ পর্যন্ত রেংগুনের ব্রিটিশ চীফ কমিশনার লন্ডনে টেলিগ্রাফ করে জানালেন মান্দালয়ে ফরাসিরা দৃঢ় ভিত্তিতে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করছে এবং খুব শীঘ্র ফরাসি আধিপত্য উত্তরে রেড রিভার পর্যন্ত বিস্তৃত হবে। ব্রিটিশ বণিকদের এইসব ভীতির কোন ভিত্তি ছিল না। বর্মার সুপন্ডিত Htin Aung তা খন্ডন করেছেন। তাহলেও এই আশংকার ফলাফল ছিল সুদূরপ্রসারী।

৬৬.৫.২ তৃতীয় ইঙ্গো-ব্রহ্ম ও বম্বে-বর্মা ট্রেডিং কোম্পানির ভূমিকা

এইরকম অস্থির রাজনৈতিক অবস্থায় ব্রহ্মরাজ ব্রিটিশ-বর্মা ট্রেডিং কোম্পানিকে জরিমানা ধার্য করেন। ১৮৬২ সাল থেকে এই কোম্পানি উত্তর বর্মায় টোংগু প্রদেশের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ সেগুন গাছের বনভূমি থেকে কাঠের ব্যবসা করছিল ব্রিটিশ জাহাজের ডেক নির্মাণ, রেলপথ নির্মাণ তাছাড়া উচ্চমানের আসবাব তৈরিতে এই সেগুন কাঠ ছিল অপরিহার্য। কাঠ ছাড়া বর্মার চাল, তেল, তুলো এবং নৌবহর (Shipping) বাণিজ্য ও পরিচালনা করত এই কোম্পানি। এখন ব্রহ্মরাজ এই কোম্পানিকে অনাবশ্যক গাছকাটার জন্য তেইশ লক্ষ টাকার জরিমানা ধার্য করলে ভারতস্থিত ব্রিটিশ সরকার প্রতিবাদ জানায় এবং এই সমস্যা সমাধানে মধ্যস্থতার জন্য প্রস্তাব পাঠানো হয়

ব্রহ্মরাজ থিবোর কাছে। কিন্তু বর্মীরাজ মধ্যস্থতায় রাজি না হলে ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে রাজতন্ত্রের কাছে চরমপত্র পাঠান হয়, যাতে বর্মার আভ্যন্তরীন নীতি, বাণিজ্য, প্রভৃতির সঙ্গে বৈদেশিক নীতি নিয়ন্ত্রণের অধিকার দাবি করা হয়। স্বভাবতই ব্রহ্মরাজ এই চরমপত্র মেনে নিতে অস্বীকৃত হলেন এবং শুরু হল তৃতীয় ইঙ্গো-ব্রহ্ম যুদ্ধ ১৮৮৫ সালে। ব্রিটিশ সৈন্য মান্দালয় অধিকার করে ব্রহ্মরাজ থিবো পত্নী সহ ভারতে নির্বাসিত হন। এইভাবে কোনবঙ রাজতন্ত্রের পতন হয় এবং সমগ্র ব্রহ্মদেশ এক ঘোষণায় ভারতের একটি প্রদেশে পরিণত হয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হয়ে যায়। নবগঠিত প্রদেশের রাজধানী মান্দালয় পরিবর্তে রেঙ্গুনে স্থাপিত হয়।

তবে ব্রহ্মে ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠা করা বেশ কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। এখানকার দুর্ধর্ষ উপজাতি শান, মোন, কারেন কোন বিদেশী নিয়ম মানতে রাজি ছিল না। তাই ব্রহ্মের উত্তরভাগে গোলযোগ চলতেই থাকে।

৬৬.৬ মালয়ী রাজ্যে উপনিবেশিকতার সূচনা

উপনিবেশিবাদ শুরু হবার পূর্বে মালয়ী রাজ্যগুলি ইন্দোনেশিয়-মালয় সাম্রাজ্যের অংশ রূপেই বিবেচিত হত। মালয় দ্বীপের ছোট ছোট রাজ্যগুলি সুলতান শাসিত অঞ্চল। উপনিবেশিকতার যুগে মালয় দ্বীপের বোর্নিও উত্তরাঞ্চলের এবং পূর্ব সুমাত্রায় স্থাপিত হয়েছিল ডাচ বা ওলন্দাজদের শাসন। মালয়ী দ্বীপের উত্তরাঞ্চলের ভ্যাসাল (Vassal—সামন্ত) সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। থাইল্যান্ডের রাজাদের সঙ্গে এবং দক্ষিণভাগের সুলতানী রাজ্যগুলি ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিল। এইভাবে গঠিত ছিল ইন্দোনেশিয়-মালয় সাম্রাজ্য।

মালয়ী দ্বীপে পশ্চিমী অনুপ্রবেশ ছিল অনেকটাই ধীরগতি সম্পন্ন এবং খুব বিচ্ছিন্ন। ষোড়শ শতকের প্রথমে পর্তুগীজ, সপ্তদশ শতকে ডাচ বা ওলন্দাজরা এবং পরে ব্রিটিশরা এখানে একের পর এক আসতে থাকে প্রধানত বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক উভয় আধিপত্য বিস্তারে আগ্রহী ছিল। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয় উপমহাদেশে ব্রিটিশ অনুপ্রবেশের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ফরাসি আক্রমণ থেকে ভারতবর্ষকে সুরক্ষিত রাখা এবং চীনের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন করার জন্য বাণিজ্যপথ (Trade route) প্রতিষ্ঠা করা।

ইউরোপে সংঘটিত যুদ্ধগুলি সর্বদাই এশিয়া আমেরিকা প্রভৃতি মহাদেশের রাজনীতির উপর প্রভাব ফেলেছে।

৬৬.৬.১ ইন্দোনেশিয়-মালয়ী সাম্রাজ্যে ডাচ আদিপত্য

ফরাসি বিপ্লব ও নেপোলিয়নের যুদ্ধ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ইঙ্গো-ডাচ সম্পর্কের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন নিয়ে আসে। এই উপমহাদেশের যে সব অঞ্চলে ওলন্দাজ আধিপত্য রয়েছে সেখানে ব্রিটিশ-বিরোধী প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হতে থাকে। জাভায় একজন ওলন্দাজ প্রশাসক মার্শাল হেরম্যানকে পাঠান হয় ১৮০৮ সালে। তিনি কিছু প্রগতিশীল কার্যক্রম গ্রহণ করলেও ক্রমে তা জাভাবাসীর মনে বিক্ষোভের সঞ্চার করে। ১৮১০ সালে তিনি স্বদেশে ফিরে যেতে বাধ্য হন। তিনি আমবোনিয়া সুরকারতা, জাকার্তার সুলতান পদের বিলোপ সাধন করে এই তিনটি পরস্পর বিরোধী সুলতানী রাজ্যকে একটি কেন্দ্রীভূত শাসনের আওতায় নিয়ে আসেন। তিনি জাভাকে নয়টি এককে বিভক্ত করেন এবং প্রতিটি এককে একজন কর্মচারী নিযুক্ত করেন। এই কর্মচারীরা ছিলেন

ডাচ কোম্পানির বেতনভোগী কর্মচারীতে। সবকিছুর উদ্দেশ্য ছিল ইন্দোনেশিয়া ও মালয়ী সাম্রাজকে প্রত্যক্ষ ডাচ শাসনাধীন করা।

৬৬.৬.২ ব্রিটিশ প্রতিক্রিয়া

এইভাবে ওলন্দাজ প্রশাসন ধীরে ধীরে জাভায় সাংগঠনিক রূপ লাভ করতে থাকলে তা ভারতস্থিত ব্রিটিশ সরকারের ভীতির কারণ হয়ে ওঠে। ব্রিটিশ সরকার জাভা অধিকার করতে মনস্থ করেন এবং ১৮১১ সালে তদানীন্তন ভারতের গভর্ণর জেনারেল লর্ড মিন্টো জাভা দখল করতে অভিযান প্রেরণ করেন। খুব সহজেই জাভা অধিকৃত হয়। জাভা তথা ইন্দোনেশিয় মালয়ী সাম্রাজ্যের প্রশাসনিক দায়িত্ব টমাস স্টানফোর্ড র‍্যাফেলস (Thomas Stanford Raffles)-কে দেওয়া হয় ও র‍্যাফেলস জাভার গভর্ণর নিযুক্ত হলেন (১৮১১—১৮১৬)।

৬৬.৬.৩ ব্রিটিশ গভর্ণর র‍্যাফলসের ভূমিকা

মালয় দ্বীপের পেনাং-এ ১৮০৫ সালে গভর্নরের সচিব নিযুক্ত হয়ে এসেছিলেন র‍্যাফেলস। মালয়ী ভাষা ও সাহিত্যে তিনি জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। এছাড়া স্থানীয় রীতি প্রথা ও ইতিহাস সম্পর্কে তাঁর যথেষ্ট জ্ঞানলাভ হয়েছিল। এই কারণে লর্ড মিন্টো ১৯০৭ সালে র‍্যাফেলস্‌কে মালয়ের প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন। ব্রিটিশ প্রতিনিধি হিসাবে তিনি যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দেন। স্থানীয় ভাষা জানার ফলে তিনি ডাচ শাসনাধীন জাভাবাসীকে তাদের অসুবিধা বোঝাতে সক্ষম হন এবং তাদের ব্রিটিশ সমর্থককে পরিণত করেন। জাভা অভিযানের প্রাক্কালে তাঁর রণকৌশল ও তথ্যাদি ভারত সরকারে কাছে ছিল অমূল্য সম্পদ। র‍্যাফেলস-এর এই দক্ষতা, অভিজ্ঞতা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতস্থিত ব্রিটিশ সরকারের ভূমিকা নিরূপণ করতে সাহায্য করেছিল। র‍্যাফেলসের মতে, ওলন্দাজ শাসন ছিল যথেষ্ট ত্রুটিপূর্ণ ও প্রজাপীড়ক তাই এখানে ব্রিটিশ প্রশাসনিক চরিত্রের পরিবর্তন প্রয়োজন। মালয়ী রাষ্ট্রব্যবস্থায় ব্রিটিশ নিরাপত্তার প্রয়োজন ঠিকই কিন্তু তা যেন প্রয়োজনের তুলনায় কঠোর না হয়। মালয়ী সমাজ ও রাষ্ট্রকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে যাতে এখানকার আর্থিক ও সামাজিক উন্নতি দ্রুততর হয়। ফলে জনসমর্থনের ভিতর দিয়ে এখানকার মানব ও প্রাকৃতিক সম্পদকে ব্যবহার করা যাবে। তিনি বুঝেছিলেন মালয়ী সম্পদকে ব্রিটিশ উৎপাদকদের জন্য ভান্ডারে পরিণত করা যেতে পারে। এজন্য প্রয়োজনের ব্যাপক সংস্কারের, যে সংস্কার কৃষক সমাজের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি ঘটাবে। কাজেই মালয়ী জনগণের উপযোগী সংস্কার গৃহীত হল, অবশ্যই তা ব্রিটিশ উপনিবেশবাদের প্রয়োজনে। র‍্যাফেলস যে সংস্কারগুলি নিয়ে এলেন তা ছিল যথেষ্টই সুদূর প্রসারী। র‍্যাফেলস এখানে প্রত্যক্ষ শাসনব্যবস্থা চালু করলেন। বংশানুক্রমিক স্থানীয় শাসকদের বেতনভোগী আমলা শ্রেণীতে পরিণত করলেন। তাদের কঠোরভাবে ব্রিটিশ প্রশাসনিক আওতায় আনা হয়। মালয় দ্বীপকে ভারতীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থার ধরনে জেলা বিভাগ ও গ্রামে বিভক্ত করা হয়। ওলন্দাজ শাসনের অযথা কঠোর ব্যবস্থাগুলি রহিত করা হয়। র‍্যাফেলস্ মুক্ত উদ্যোগে (free enterprise) বিশ্বাসী ছিলেন তাই তিনি জবরদস্তি যোগান ব্যবস্থাকে তুলে দিলেন। শুধু প্রেয়াংগার জেলার কফির চাষ ও যোগানের ক্ষেত্রে তা অব্যাহত রইল। এই

প্রথম কৃষকশ্রেণীকে উৎপাদন ও বিক্রয়ের স্বাধীনতা দেওয়া হল। তারা তাদের পছন্দানুযায়ী শস্য উৎপাদন করতে পারবে বলা হল। ভারতীয় রীতি অনুসারে ব্রিটিশ সরকার এইসব জমিতে কর নির্ধারণ করতে পারবেন। এখানে র‍্যাফেলস্ মাদ্রাজের লেফটানেন্ট কর্নেল কলিন ম্যাকেঞ্জীর অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়েছিলেন। মাদ্রাজের রায়তওয়ারী ব্যবস্থায় উৎপাদক যে জমির মালিক হতেন সেই জমির বার্ষিক খাজনা তাকে সরকারকে দিতে হত। র‍্যাফেলস্ ঘোষণা করেছিলেন সরকার হলেন সব জমির মালিক। জমির উর্বরতা অনুসারে কর ধার্য হবে। তাই উর্বর জমি কৃষককুল উৎপাদনের মূল্যের অর্ধ শতাংশ এবং অল্প উর্বর জমির উৎপাদক তার উৎপাদিত মূল্যের এক-চতুর্থাংশ কর হিসাবে সরকারকে দেবে। এইভাবে জমির করদানের মধ্যে দিয়ে উৎপাদক ও কৃষক সমাজ জবরদস্তি যোগানের হাত থেকে রেহাই পায়। জবরদস্তি শ্রম, যোগান এবং আকস্মিক যোগান প্রভৃতি ছিল ওলন্দাজ শাসনব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ব্রিটিশ প্রশাসনাধীন মালয়ী সমাজ এই অন্যায় ব্যবস্থার হাত থেকে মুক্তি পায়।

৬৬.৬.৪ র‍্যাফেলসের কার্যকলাপের ফলশ্রুতি

ব্রিটিশ সরকার র‍্যাফেলসের নেতৃত্বে যে ব্যবস্থা মালয়ে গ্রহণ করলেন তার ফলাফল ছিল দুই ধরনের প্রথমত, সরকার এই ব্যবস্থায় প্রত্যক্ষ ভাবে উৎপাদকদের সঙ্গে যুক্ত হতে পারলেন একই সঙ্গে প্রশাসনিক ব্যবস্থার অন্যতম একক গ্রামসমাজের সঙ্গে তার সংযোগ রইল(দ্বিতীয়ত, সর্বপ্রকার উৎপাদক, কৃষকদের জন্য বাজার উন্মুক্ত হল। তার ফলে নিজ পণ্য বিক্রয় করে কৃষকশ্রেণীর হাতে অর্থ আসতে লাগল যা দিয়ে তারা অন্য কোন ভোগ্যপণ্য ক্রয় করার ক্ষমতা অর্জন করতে পারল।

J.S. Furnivall বলেছেন র‍্যাফেলসের মানবতাবাদী কর্মকাণ্ড সাধারণ জনতাকে স্থানীয় শাসকের অত্যাচারের হাত থেকে রেহাই দিয়েছিল(তাঁর বাস্তববাদিতা কৃষকদের হাতে অর্থ এনে দিয়েছিল, যাতে তারা ইংল্যান্ডে প্রস্তুত পণ্য কিনতে পারে।

একথা সত্য যে ওলন্দাজ ও ব্রিটিশ সকলেরই প্রয়োজন ছিল বাণিজ্যিক কাঁচামালের কিন্তু ব্রিটেনে প্রস্তুতপণ্য ছিল, বিশেষত বস্ত্র খুবই সস্তা। পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলি কাঁচামাল নিয়ে গিয়ে পণ্যদ্রব্য প্রস্তুত করে উপনিবেশে সরবরাহ করত। ধীরে ধীরে ব্রিটিশদের কাছে এই রপ্তানি ব্যবসা সস্তা দামের কারণে তাই খুব লাভজনক হয়ে যায়।

৬৬.৬.৫ তাঁর নীতির সীমাবদ্ধতা

তবে র‍্যাফেলসের সংস্কার ত্রুটিমুক্ত ছিল না এবং সর্বত্র সফল ছিল তাও বলা যায় না। প্রথমত, পুরানো **regent** কে সরিয়ে যে সব গ্রামপ্রধানের ওপর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল তারা অনেক সময়ে অন্যায়-অবিচার করতেন গ্রামবাসীর উপর। দ্বিতীয়ত, সরকারকে নগদ অর্থে কর দেবার রীতি চালু হওয়াতে নগদ অর্থের জন্য স্থানীয় জনগণ কৃষককুল চীনা মহাজন ও সুদ ব্যবসায়ীদের কাছে দ্বারস্থ হয়ে পড়ে। চীনা মহাজনদের সুদের হার ছিল খুবই চড়া। কারণ ইতিপূর্বে তারা চাল প্রভৃতি উৎপাদিত পণ্যে করদান করে এসেছে। নগদ অর্থ তাদের

কাছে কখন ছিল না। অথচ সরকারি কুঠি (Residency Head-quarters)— গুলিতে নগদ অর্থে তাদের কর প্রদানে বাধ্য করা হয়েছিল। তৃতীয়ত, গ্রামের কৃষকশ্রেণীর মধ্যে জমি বন্টনের ব্যাপারে কোন রূপ সরকারি পরিদর্শন রীতি চালু ছিল না। যদিও এক্ষেত্রে সরকারি কর্মচারীর অপ্রতুলতা ছিল তাই উৎপাদক বা কৃষকশ্রেণী ঠিক কি ধরনের জমি লাভ করছে বা জমি বন্টনের কিরূপ হবে— তা নির্ধারণের জন্য কোন সরকারি নীতি গৃহীত হয়নি বলে কৃষকশ্রেণী গ্রামপ্রধানের সালিশীর উপরই নির্ভরশীল ছিল। কাজেই গ্রাম প্রধানের ইচ্ছা ও বিবেচনাবোধের উপর কৃষকরা নির্ভর করতে থাকে।

চতুর্থত, র‍্যাফেলস পণ্যের বাধ্যতামূলক উৎপাদনের সম্পূর্ণ বিলোপসাধন করেননি। কারণ যে সব জেলাগুলিতে বাধ্যতামূলক পণ্য উৎপাদন বজায় ছিল, যেমন প্রেয়াংগারের কফি চাষ সেখানে প্রাচীন রীতি বজায় রাখা হয়েছিল অর্থাৎ জবরদস্তি উৎপাদন ও যোগান ব্যবস্থা কফি, কাঠ উৎপাদক জেলাগুলিতে বহাল রইল।

তবে তিনি স্থানীয় বাণিজ্যের প্রভূত উন্নতিসাধন করেন। অনেকগুলি উৎপীড়নমূলক বাণিজ্যকর তিনি তুলে দিয়েছিলেন। মালয় উপদ্বীপের পূর্বভাগে চোরাচালান বন্ধ করার জন্য নৌ-বাহিনী তৈরি করেছিলেন। ফলে আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য লক্ষণীয় হারে বৃদ্ধি পেয়েছিল।

এখানে বিচারব্যবস্থার ক্ষেত্রেও তিনি পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। স্থানীয় বিচার পরিচালনার জন্য স্থাপিত হয় ষোলটি বিচারালয় (Land courts) যার বিচারপতি হলেন রেসিডেন্ট ও স্থানীয় সরকারি কর্মচারীরা সভ্য পেলেন। ছোট ছোট দেওয়ানী ফৌজদারী মামলার নিষ্পত্তি এখানে করা হত, পুলিশী বিচার হত, এছাড়া কোন মৃত্যুদণ্ডের ব্যাপারে লেফটানেন্ট গভর্ণরের অনুমোদন জরুরী ছিল। এখানে জুরী দ্বারা বিচারের ব্যবস্থাও ছিল। যদিও এই ব্যবস্থা সমালোচিত হয়েছিল তবুও বলা যায় জুরী ব্যবস্থা ছিল "typical British institutions to absolutely foreign soil..." ইতিমধ্যে ১৮১৪ সালের পর ইউরোপে নেপোলিয়ানের যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবার পর ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে হল্যান্ডকে ফ্রান্সের প্রতিপক্ষ রূপে প্রতিষ্ঠা করে ইউরোপের শক্তিসাম্য রক্ষার ব্যাপারে চিন্তাভাবনা শুরু হয়। তাই ডাচ উপনিবেশগুলি থেকে ব্রিটিশ কর্তৃত্ব সরিয়ে সেখানে ওলন্দাজ বা ডাচদের পুনস্থাপন করে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া উপমহাদেশেও ফরাসি প্রতিপক্ষ রূপকে দাঁড় করানোর প্রচেষ্টা দেখা গেল।

১৮১৪ সালে র‍্যাফেলস লন্ডনে চলে যান এবং ইন্দোনেশিয়া-মালীয় উপদ্বীপের অঞ্চলগুলিতে পূর্বেকার ওলন্দাজ আধিপত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮১৮ সালে র‍্যাফেলস পুনরায় লেফটেনান্ট গভর্নর হয়ে এলেন বেনকুলেন অঞ্চলে। এটি দক্ষিণ-পশ্চিম সুমাত্রার অখ্যাত এক বাণিজ্য অঞ্চল। ইতিমধ্যে মালয়ী উপদ্বীপে ডাচরা পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছে।

৬৬.৭ মালয়ী রাজ্যে ওলন্দাজ পুনরভ্যুত্থান

কিছু জায়গায় নতুন ওলন্দাজ বন্দর বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছিল। ওলন্দাজরা ব্রিটিশ বাণিজ্যকে প্রতিহত করার জন্য প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয় এবং বাটাভিয়া (জাকার্তা) ছাড়া অন্য কোথাও ব্রিটিশ বাণিজ্যতরী প্রবেশ নিষিদ্ধ করে। এই অবস্থায় র‍্যাফেলস ভারতস্থিত ব্রিটিশ সরকারকে ব্রিটিশ বাণিজ্যের বিপদ সম্পর্কে সচেতন বাণিজ্যক আধিপত্য থাকবে এবং যেখান থেকে ওলন্দাজ বাণিজ্য এবং কর্তৃত্ব দুটিরই মোকাবিলা করা যেতে পারে। কারণ ওলন্দাজদের হাতে মালাক্কা প্রণালী থাকার ফলে প্রতিদিনই এই উপদ্বীপ অঞ্চলে ডাচ আধিপত্য বৃদ্ধি পাচ্ছিল।

৬৬.৭.১ সিংগাপুরের প্রতিষ্ঠা

এখানে উল্লেখ্য যে ব্রিটিশ সরকার এই সময়ে ডাচ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয়ে ব্রিটেন ও নেদারল্যান্ডের মধ্যে তথাকথিত মিত্রতাকে বিনষ্ট করতে চায়নি। র‍্যাফেলস চেয়েছিলেন রিহো (Rhio) দ্বীপে ব্রিটিশ প্রতিরোধ কেন্দ্র স্থাপন করতে কিন্তু এখানে পূর্বেই ডাচরা চুক্তির মাধ্যমে পৌঁছে গিয়েছিল। এরপর তাঁর দ্বিতীয় পছন্দ ছিল জোহর দ্বীপের সিঙ্গাপুর গ্রামটি। সিঙ্গাপুর ছিল মালয়ী জাতি অধ্যুষিত মৎসজীবীদের একটি চোট গ্রাম। র‍্যাফেলস এখানে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কুঠি (factory) খোলার বা স্থাপনের অনুমতি পান। সিঙ্গাপুর জোহর (Johore) রাজ্যের একটি অংশ ছিল এবং এখানে ১৮২২ সাল থেকে সুলতানের মৃত্যুর পর থেকে একটি রাজনৈতিক অস্থিরতা চলছিল। মৃত সুলতানের জ্যেষ্ঠ পুত্র বিতাড়িত হয়ে সিঙ্গাপুরের নিকটস্থ বুলাং (Bulang) দ্বীপে ছিলেন এবং সুলতান পুত্রের প্রতি সিঙ্গাপুর, তেমেংগং (Temenggong) অঞ্চলের মালয়ী বাসীর সমর্থন ছিল। র‍্যাফেলস ছিলেন বাস্তববুদ্ধি সম্পন্ন রাজনীতিক। যিনি সুরতানপুত্রকে সিঙ্গাপুরে আমন্ত্রণ জানালেন এবং জোহোরের সুলতান রূপে তাকে স্বীকার করে নিলেন। ১৮১৯ সালে সুলতান হুসেনের সঙ্গে স্বাক্ষরিত হয় ও সিঙ্গাপুরে ব্রিটিশ কর্তৃত্ব বৈধতা লাভ করে।

৬৬.৭.২ সিঙ্গাপুরের বাণিজ্যিক গুরুত্ব

সিঙ্গাপুরের অবস্থিতি ছিল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া উপমহাদেশের এক গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে। মালয়ী উপদ্বীপের সুদূর দক্ষিণে অবস্থিত এই বন্দরটি ইউরোপ ও চীনের মধ্যে সবচেয়ে কম দৈর্ঘ্যের যাত্রাপথকে উন্মুক্ত ক(ক, যা এতদিন ধরে ব্রিটিশরা আকাঙ্খা করে আসছিল। ইতিপূর্বে উত্তমাশা অন্তরীপ হয়ে মালাক্কা প্রণালীর মধ্যে দিয়ে জাহাজকে আসতে হত কিন্তু সিঙ্গাপুরের উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করে এরপর থেকে সম্পূর্ণ যাত্রাপথের এক হাজার মাইল দীর্ঘ পথ সংক্ষিপ্ত হয়ে গেল। একই সঙ্গে প্রাচ্যে ডাচ একাদিপত্যকে প্রতিহত করার জন্য সিঙ্গাপুরের উত্থান সম্পূর্ণ হল। ঠিক যেমনটি হয়েছিল পশ্চিমের মাল্টা দ্বীপের ক্ষেত্রে। তেমনভাবে পূর্বে সিঙ্গাপুরকে প্রতিষ্ঠা করা হল।

খুব স্বাভাবিকভাবে এই অবস্থাকে ওলন্দাজরা মেনে নিতে পারেনি। তারা সুলতান হুসেনের সঙ্গে সম্পাদিত

১৮২৪ সালে ইঙ্গো-জোহর চুক্তি মানতে অস্বীকার করে। তাঁদের মতে সুলতান হুসেনের কোন রাজনৈতিক বৈধতা নেই। এছাড়া ওলন্দাজদের সঙ্গে ইতিপূর্বেই ১৮১৮ সালে রিহো অঞ্চলের চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। যাতে জোহর রাজ্যের সিঙ্গাপুরের উপর স্বাভাবিক ভাবেই ডাচই কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাই নতুন করে ১৮১৯ এর সম্পাদিত ইঙ্গো-জোহর (তথা সিঙ্গাপুর) চুক্তির কোন বৈধতা নেই। তাই সিঙ্গাপুরকে ডাচদের কাছে প্রত্যর্পণ করতে হবে।

ইতিমধ্যে ১৮১৯ সালের পর থেকে সিঙ্গাপুরের দ্রুত পরিবর্তন ঘটেছিল। জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল প্রায় দশগুণ। একবছরের মধ্যেই এখানকার অগ্রগতি, যা ব্রিটিশদের চুক্তির ফলে শুরু হয়েছিল, দূর-দূরান্তের মানুষকে আকর্ষণ করেছিল। সিঙ্গাপুর বন্দরটি ছিল খুবই উৎকৃষ্ট এক বন্দর। এখান থেকে পরিচালিত হত মুক্ত বাণিজ্য। এখানে ছিল শক্তিশালী ও সুরক্ষিত উন্নত সমুদ্র বাণিজ্য। সিঙ্গাপুরের সামরিক সুরক্ষা ও তৎকালীন সমৃদ্ধ শিল্পাঞ্চল বহু মানুষকে এখানে বসতি স্থাপনে আগ্রহী করে তুলেছিল। এখানে বাণিজ্য, ইনসুরেন্স, ব্যাঙ্কিং ব্যবসা নৌপরিবহন প্রভৃতির ভারতীয় ও সিংহলী শাখা চালু করা হয়েছিল।

এইভাবে প্রতিবছর সিঙ্গাপুরে ব্রিটিশ অবস্থিতি শক্তিশালী ও দৃঢ় হয়ে চলেছিল। সিঙ্গাপুরে ব্রিটিশ সমৃদ্ধি ওলন্দাজদের কাছে সুখবর ছিল না। মালয় উপদ্বীপে ব্রিটিশ আধিপত্য খর্ব করার জন্য ওলন্দাজরা প্রস্তুত হতে থাকে। তবে ব্রিটিশদের কাছে এই সময়টি ছিল সংহতিকরণের পর্যায়কাল তাই অনাবশ্যক যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে ব্যয়ভার বাড়ানোর ইচ্ছে তাদের ছিল না।

৬৬.৭.৩ ১৮২৪ সালের চুক্তি ও মালয়ী রাজ্যে ব্রিটিশ প্রতিষ্ঠা লাভ

১৮২৪ সালে নেদারল্যান্ড ও ব্রিটেনের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয় উপমহাদেশে পুনরায় কোন যুদ্ধজালে জড়িয়ে না পড়ে স্থায়ী ও শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখে নেদারল্যান্ড মালক্কা ও সিঙ্গাপুরে ব্রিটিশ অধিকার স্বীকার করে নেয়। এছাড়া উভয় রাষ্ট্রই একে অন্যের বন্দর থেকে নির্দিষ্ট মূল্যে নৌপরিবহন করবে স্থির হয়।

১৮২৪ সালের এই চুক্তির ফলে মালয়ী উপদ্বীপ থেকে ওলন্দাজ বাণিজ্য প্রত্যাহৃত হলে ব্রিটিশ প্রভাব, আধিপত্য স্থাপিত হয়। পক্ষান্তরে ইন্দোনেশিয়ার উপর ডাচ কর্তৃত্ব ব্রিটেন মেনে নেয়। এইভাবে ইন্দোনেশিয়-মালয়ী সাম্রাজ্য দুটি পাশ্চাত্য রাষ্ট্রবর্গের পৃথক প্রভাবাধীন অঞ্চলে পরিণত হয়।

৬৬.৭.৪ ১৮২৪ সালের পরবর্তী সমস্যাগুলি

১৮২৪ সালের পর প্রায় পঞ্চাশ বছর মালয় উপদ্বীপে ব্রিটিশের পক্ষ থেকে একরকম 'না হস্তক্ষেপ' নীতি প্রযুক্ত হয়েছিল। তবে সরকারি কর্মচারী এবং বণিকগোষ্ঠী বিভিন্ন কারণে সরকারে উপর চাপ সৃষ্টি করতে থাকে মালয় দ্বীপে সরকারি নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য। ১৮৫০ সালের পর থেকে টিনের খনিগুলিতে সিঙ্গাপুর ও পেনাং এর চীনা,

ইউরোপীয় বণিকরা অর্থ লগ্নি করছিল। এই বণিকগোষ্ঠী মালয়ী খনিজ ভাণ্ডার ও সম্পদ সম্পর্কে যথেষ্টই ধারণা রাখত। অন্যদিকে মালয় দ্বীপে রাজনৈতিক স্থিরতা ছিল না। বিভিন্ন সুলতানী রাজ্যগুলিতে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব সর্বদাই লেগে থাকত। প্রতিটি রাজ্য একে অন্যকে ঈর্ষা করত, চোরাচালান বৃদ্ধি পাচ্ছিল, জলপরিবহন সুরক্ষিত ছিল না। এই পরিস্থিতিতে যে সব বণিকরা বাণিজ্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রগুলিতে অর্থ লগ্নি করেছিল তারা চাইছিল বর্ধিত হারে লাভের অর্থ ফেরৎ পেতে কিন্তু রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে তাদের বাণিজ্যিক ভবিষ্যত অনিশ্চিত হয়ে পড়ছিল তাই ব্রিটিশ সরকারের উপর বণিকগোষ্ঠীর পক্ষ থেকে চাপ আসতে থাকে মালয় উপদ্বীপে ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রণ আধিপত্য প্রসারণের জন্য।

এছাড়া যেসব চীনা শ্রমিক কাজ করত তারা সবাই গুপ্ত সমিতির সদস্য ছিল। খনি ব্যবসায়ের সিংহভাগ ছিল চীনা বণিকদের হাতে। এই বণিকরা চীনের গুপ্ত সমিতির সদস্য ছিলেন। রাজনৈতিক অস্থিরতা, গুপ্ত সমিতির কর্মকাণ্ড ইত্যাদি মালয়ে চীনা ও ব্রিটিশদের মধ্যে সংঘর্ষের সূত্রপাত করে। চীনারা বেশিরভাগ সময়ে রাজতান্ত্রিক ক্ষমতার লড়াই ও ষড়যন্ত্রে অংশগ্রহণ করত। ১৮৭১ থেকে ১৮৭৩ সাল পর্যন্ত দুবছর সময়কালে পেরাক **(Perak)** অঞ্চলের নৈরাজ্য রাজতান্ত্রিক অস্থিরতা এই পরিস্থিতি অর্থাৎ ব্রিটিশ ও চীনাদের মধ্যে যে টানাপোড়েন চলছিল সেই পরিস্থিতিকে আরো সঙ্কটজনক করে তোলে। ফলে ১৮২৪ সালে মালয়ী সুলতানদের সঙ্গে ব্রিটিশ সরকারের যে চুক্তি বা বন্দোবস্ত হয়েছিল তা ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়, শান্তি বিঘ্নিত হতে থাকে সর্বত্রই, বিশেষ করে পেনাঙ অঞ্চলে।

৬৬.৭.৫ আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি

এই সময়ে অর্থাৎ ঊনবিংশ শতকের শেষার্ধে টিনের চাহিদা খুব বৃদ্ধি পেয়েছিল। আমেরিকায় এই সময় চলছিল গৃহযুদ্ধ। সামরিক প্রয়োজনে টিনের চাহিদা বৃদ্ধি পেতে থাকে। তেল মজুদ রাখারজন্য পিপা তৈরির কারণে টিনের প্রয়োজন হয়। এছাড়া সৈন্য চাউনির জন্য বড়ো টিনের পাতের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। হল্যান্ড, জার্মানি, ফ্রান্স প্রভৃতি রাষ্ট্রগুলি আমেরিকাকে টিন সরবরাহ করার জন্য প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হলে ব্রিটিশ বণিকদের পক্ষ থেকে এই খনিজ দ্রব্য সরবরাহ করার জন্য প্রচণ্ড উৎসাহ দেখা দিলে তারা সরকারি হস্তক্ষেপ দাবি করে মালয়ী টিন খনিগুলির উপর, যেখানে চীনাদের একাধিপত্য ছিল। এই কারণে আকস্মিকভাবে টিনের গুরুত্ব বেড়ে গেলে এই ধাতুটি সরবরাহের জন্য একটা চাহিদা সৃষ্টি হয় ও ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক দপ্তরে বণিকদের কাছ থেকে চাপ আসতে থাকে।

ইতিমধ্যে সুয়েজ খালের উন্মোচন (১৮৬৯ সালে) ভারত-ব্রিটেনের দূরত্বই নয় ইউরোপ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মধ্যে দূরত্ব অনেকটা কম করেছিল। ১৮৭১ সালে সিঙ্গাপুরে টেলিগ্রাফ স্থাপিত হয়েছিল, নৌপরিবহনে উন্নতি এসেছিল, বাষ্পীয় জাহাজ চলতে শুরু করেছিল ফলে ইউরোপীয় অন্যান্য রাষ্ট্রগুলি প্রত্যক্ষ ভাবে মালয়ী উপদ্বীপ তথা সিঙ্গাপুরের ও বাকি সমুদ্র বন্দরগুলির সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছিল। ১৮৬০ সালে মলুক্কাস অধিকার করে নেয়

ওলন্দাজরা। ১৮৫৯ সালে কোচিন-চীনে এবং ১৮৬২ সালে কম্বোডিয়াতে ফরাসি আধিপত্য ও প্রোটেকটরেট স্থাপিত হয়।

মালয়ী উপদ্বীপের নিকটস্থ অঞ্চলগুলিতে অন্যান্য পশ্চিমী রাষ্ট্রের উপস্থিতি ও বাণিজ্য ব্রিটিশ বণিকদের আশংকার কারণ হয়ে ওঠে। এখানে প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে ১৮৫৭ সালের পর ভারতবর্ষে কোম্পানি শাসনের অবসান হয়ে যাবার পর মহারানী ভিক্টোরিয়ার সনদে ভারত সহ ব্রিটেনের অন্যান্য সহ উপনিবেশগুলিকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রত্যক্ষ প্রশাসনাধীনে নিয়ে আসা হয়। ১৮২৪ সালের বন্দোবস্তের ফলে যে সব দ্বীপগুলিতে ব্রিটিশ অধিকার স্থাপিত হয়েছিল [যেমন পেনাং, মালাক্কা, ওয়েলসলী প্রদেশ (Province Wellesley) সিঙ্গাপুর—ইত্যাদি অঞ্চলগুলিকে একত্রে Straits Settlements বলা হত] সেইসব অঞ্চল ১৮৬৭ সাল থেকে ইন্ডিয়া অফিস কর্তৃক শাসিত হতে থাকে।

৬৬.৭.৬ মালয়ী ফেডারেশন প্রতিষ্ঠা

বস্তুতপক্ষ বাণিজ্যিক স্বার্থ, মালয়ের রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা ও তৎকালীন ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ব্রিটিশ সরকারে নীতি পরিবর্তনের সুযোগ নিয়ে আসে। ১৮৭৩ সালে মালয়ের গভর্নর স্যার হ্যারি অড (Sir Harry Ord) বণিক সম্প্রদায় ও উপনিবেশিকদপ্তরের চীনা প্রতিনিধিদের স্বপক্ষ আবেদন জানালেন ব্রিটিশ সরকারের কাছে। তাঁর পরবর্তী গভর্নর এ্যান্ড্রু ক্লাক (Sir Andrew Clarke)-কে মালয়ের ব্রিটিশ বাণিজ্যিক স্বার্থ রক্ষার জন্য সর্বপ্রকার সুবিধা দিতে পাঠান হলে তিনি মালয়ের রাজনৈতিক অস্থিরতাকে দমন করেন। পেরাক, সেলাংগোরের গৃহযুদ্ধ দমন করেন। ১৮৯৫ সালে জোহের (Johore) অঞ্চলে ব্রিটিশ প্রটেকটরেট স্থাপিত হয়। এই বছরই পোরাক, সেলাংগোর পেহাং, নেগ্রিসেমবিলাম— এই চারটি অঞ্চল নিয়ে একটি ফেডারেশন গঠন করাহয় একজন রেসিডেন্ট জেনারেলের অধীনে। এই রেসিডেন্ট জেনারেলের অফিস স্থাপিত হল কুয়ালালামপুরে। এই কুয়ালালামপুরই বর্তমান আধুনিক মালেশিয়া বা মালেশিয়ার রাজধানী। চারটি রাজ্য নিয়ে ফেডারেশন গঠিত হলেও তা ছিল রেসিডেন্ট জেনারেলের নেতৃত্বে ব্রিটিশদেরই কেন্দ্রীভূত শাসনব্যবস্থা। তাই বলাহয় ফেডারেটেড মালয় রাষ্ট্র "...not a nation but an amalgamation".

৬৬.৮ সারাংশ

আলোচ্য এককটিতে উপস্থিত করা হয়েছে ব্রহ্ম দেশ ও ইন্দোনেশিয়-মালয়ী সাম্রাজ্যে ক্রমিক পর্যায়ে পশ্চিমী অনুপ্রবেশ এবং তার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া। চতুর্দশ পূর্বে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া উপমহাদেশ ইউরোপীয়দের কাছে অজ্ঞাত ছিল। এখানে আধিপত্য স্থাপনের উদ্দেশ্য ছিল চীনের সঙ্গে বাণিজ্যের পথ প্রস্তুত করে নেওয়া। বর্মার ক্ষেত্রে

দেখা গেল ইংরেজরা এখানে সাম্রাজ্যবাদী শাসন কায়েম করতে ততটা আগ্রহী ছিল না। পরে ভারতে আধিপত্য স্থাপনের সঙ্গে চীনের উপর প্রভূত্ব বিস্তারের প্রয়াস পরিচালিত হল পেগু, আরাকান, তেনাসেরিমের উপর দিয়ে। এইভাবে ইঙ্গো-ব্রহ্ম রাজনৈতিক সম্পর্কের সূত্রপাত হলো। বর্মায় সম্ভাব্য ফরাসি আধিপত্য প্রতিহত করার জন্য আবির্ভূত হয়েছিল ব্রিটিশরা তেমনই মালয়ী রাজ্যে ডাচ আধিপত্য খর্ব করার জন্য ব্রিটিশ প্রসারণ শুরু হল।

শেষ পর্যায়ে আমরা দেখতে পেয়েছি দুটি রাষ্ট্রে উপস্থিত ব্রিটিশ বণিক সম্প্রদায় নিজ স্বার্থে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী কার্যকলাপ পরিচালিত করেছিল। বণিকশ্রেণীর অকারণ ভীতির কারণে ব্রিটিশ বাণিজ্যিক স্বার্থ রক্ষার জন্য দুটি রাষ্ট্র ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতাবাদের শিকার ক্ষেত্রে পরিণত হয়।

৬৬.৯ অনুশীলনী

ক। বিষয়মুখী প্রশ্ন

১। বর্মার প্রাচীন রাজধানীর নাম কি?

২। বর্মার রাজধানী কতবার এবং কোথায় স্থানান্তরিত হয়?

৩। ব্রহ্মের একমাত্র রানীর নাম লিখুন।

৪। শান ও মোন জাতি কোথায় বসবাস করত?

৫। কুনবঙ রাজতন্ত্রের প্রথম রাজার নাম কি?

৬। রেঙ্গুন শব্দের অর্থ কি?

৭। ইয়ান্দাবু সন্ধি কত সালে সম্পাদিত হয়?

৮। র‍্যাফেলস কে ছিলেন?

খ। সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্ন

১। মালয়ী ফেডারেশন কীভাবে স্থাপিত হয়?

২। ব্রহ্মরাজ মিন্দন মিনের সঙ্গে ব্রিটিশ সম্পর্ক বর্ণনা করুন।

৩। ব্রিটিশ বণিকদের ভীতি কীভাবে ব্রহ্মে ও মালয়ে ব্রিটিশ উপনিবেশবাদকে সক্রিয় করেছিল?

৪। ব্রহ্মরাজ মিন্দনের সংস্কারগুলির একটি চিত্র প্রস্তুত করুন।

৫। কী পরিস্থিতিতে সিঙ্গাপুরে উত্থান হল?

গ। দীর্ঘ উত্তরে প্রশ্ন

১। ঊনবিংশ শতাব্দীতে কী কারণে বর্মায় ব্রিটিশ উপনিবেশবাদের সূচনা হয়। এর ফলাফল কি ছিল?

২। মালয়ে ব্রিটিশ গভর্নর র‍্যাফেলসের অবদান কিরূপ?

৩। ১৮২৪ সালের পর দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর বাদে ব্রিটিশরা কেন মালয় পুনরায় মনোযোগী হয়ে ওঠে?

৪। সিঙ্গাপুরের গুরুত্ব নিরূপণ করুন।

৬৬.১০ গ্রন্থপঞ্জী

1. H.M. wright—The making of South-East Asia. Routledge and kegan paul 1970.
2. J.F. Cady—A History of Modern Burma Cornell University Press.
3. D.R. Sardesai—South-East Asia—Past and Present. Vikas Publishing 1981.
4. Khoo Kay Kim (ed)—The History of South-East Asia—Essays and Documents. O.U.P. 1977.
5. J.F. Cady—South-East Asia—Its historical development, Megraw Hill 1979.
6. Lea E. Williams—South-East Asia—A History, O.U.P. 1976.
7. জহর সেন—দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ইতিহাস।

একক ৬৭ ❑ থাইল্যান্ড বা শ্যামদেশে পাশ্চাত্য শক্তির অনুপ্রবেশ

গঠন

৬৭.০ উদ্দেশ্য

৬৭.১ প্রস্তাবনা

৬৭.২ শ্যামদেশে ঔপনিবেশিক শক্তির বিস্তার

৬৭.৩ শ্যামদেশে চক্রীরাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা

    ৬৭.৩.১ চক্রীরাজতন্ত্রের বাস্তবমুখী নীতি
    ৬৭.৩.২ ঔপনিবেশিকতার যুগে থাইল্যান্ডের ব্যতিক্রমী চরিত্র
    ৬৭.৩.৩ থাইল্যান্ডে পরিবর্তনের সূত্রপাত
    ৬৭.৩.৪ চক্রী রাজতন্ত্রের কৃতিত্ব
    ৬৭.৩.৫ চতুর্থ রাম বা মঙ্কুটের সময়কাল
    ৬৭.৩.৬ থাইলরান্ডে নতুন যুগের সূচনা

৬৭.৪ চক্রীরাজ চুলালংকর্ণ-র সময়কালে ঔপনিপেবিকতাবাদ

৬৭.৫ শ্যামদেশে ঔপনিবেশিকতাবাদের ফলাফল

৬৭.৬ সারাংশ

৬৭.৭ অনুশীলনী

৬৭.৮ গ্রন্থপঞ্জী

৬৭.০ উদ্দেশ্য

শ্যামদেশ বা থাইল্যান্ডের রাজতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য রাষ্ট্রগুলির থেকে পৃথক ছিল। বর্তমান এককটি পাঠ করে আপনারা সেগুলি অর্থাৎ নিম্নবর্ণিত বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কে জানতে পারবেন—

- থাই রাজতন্ত্রের বাস্তববাদী প্রকৃতি।
- ঔপনিবেশিকতার যুগেবিভিন্ন রাষ্ট্রের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন।
- কূটনৈতিক দক্ষতায় থাইল্যান্ডের স্বাধীনতা রক্ষা।
- বিবিধ পশ্চিমী প্রযুক্তি গ্রহণ।
- শ্যামদেশের সার্বিক পরিবর্তন।

৬৭.১ প্রস্তাবনা

ঊনবিংশ শতকে যখন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য দেশ ইউরোপের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদী শক্তির পদানত তখন শ্যামদেশ বা থাইল্যান্ডে রাজনৈতিক স্বাধীনতা অক্ষুন্ন ছিল। বস্তুতপক্ষে ব্রহ্ম এবং শ্যামদেশে বিদ্যমান ছিল শক্তিশালী রাজতন্ত্র অর্থাৎ এইদুটি রাষ্ট্রে রাজতান্ত্রিক ঐতিহ্য পরিলক্ষিত হয়েছিল। ব্রহ্মের রাজতন্ত্র যেমন বর্মী জনগণের দুঃখের কারণ হয়েছিল বিপরীতভাবে শ্যামের রাজতন্ত্র সেই রাষ্ট্র ও জনতার গর্বের কারণ হয়ে উঠেছিল। এখন ত’আই বা তাই শব্দের অর্থ হল ‘মুক্ত’ (Tai means free)। থাইল্যান্ডের মানুষ ছিলেন স্বাধীনতাপ্রিয়। এই কারণে যে সময় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য রাষ্ট্রে যখন দেখা যাচ্ছিল বিভিন্ন জাতি, উপজাতি, রাজতান্ত্রিক সংঘর্ষ সেই সময়ে থাইল্যান্ড বা শ্যামদেশে ছিল ব্যতিক্রম। তবে ঐতিহাসিক নথিপত্রে থাইল্যান্ডকে বর্ণনা করাহয়েছে ‘রাজতন্ত্র ও যুদ্ধবিগ্রহের কথা’ বলে (tales of dynasties and battles)।

ব্রহ্মদেশের ইতিহাস থেকে জানা যায় থাই-ব্রহ্ম সংঘর্ষ লেগেই থাকত। থাইল্যান্ডের প্রাচীন রাজধানী আয়ুধায়া (Ayudhaya)-র উপর বর্মী আক্রমণ সমগ্র ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত ছিল সাধারণ ঘটনা। এর মূল্যে অবশ্য একটা কারণ ছিল এই যে আয়ুধারায় একটি অঞ্চলে প্রচুর সংখ্যায় শ্বেতহস্তী বাস করত। শ্বেতহস্তী ছিল একাধারে রাজকীয় মহিমা প্রদর্শনের লক্ষণ ও হিন্দু এবং বৌদ্ধধর্মের পূজ্য প্রাণী।

৬৭.২ শ্যামদেশে ঔপনিবেশিক শক্তির বিস্তার

ব্রিটেন ও ফ্রান্স দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে বাণিজ্যিক কাজকর্মের অন্তরালে তৈরি করে চলেছিল রাজনৈতিক প্রভাবাধীন অঞ্চল, যেখানে বজায় থাকবে তাদের অর্থনৈতিক প্রতিপত্তি ও রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব। এক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা সফল ছিল ব্রিটেন। ব্রিটিশরা একের পর এক ভারত, বর্মা, চীন প্রভৃতি রাষ্ট্রে বাণিজ্যের আড়ালে চূড়ান্ত রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করছিল। এক্ষেত্রে ফ্রান্সও পিছিয়ে ছিল না। ইন্দোচীনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ফরাসি আধিপত্য।

এই সময়ে অর্থাৎ ঊনবিংশ শতাব্দীতে দেখা গেল ব্রিটেন পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে অর্থাৎ ব্রহ্মদেশ হয়ে পূর্বে অগ্রসর হচ্ছিল এবং ফ্রান্স টংকিন হয়ে পশ্চিম মেকঙের দিকে আসছিল আর এই দুই বৃহৎ শক্তি প্রসারিত অঞ্চলের মধ্যর্তী স্থানে ছিল শ্যামদেশ। পশ্চিমী রাষ্ট্রদুটির কেউই তাদের জায়গা ছাড়তে রাজী ছিল না। সুতরাং এই অবস্থায় শ্যাম বা থাইল্যান্ডের মধ্যবর্তী অবস্থান দুটি রাষ্ট্রেরই প্রয়োজন ছিল। ফলে আপাতভাবে থাইল্যান্ড তার স্বাধীনতা বজায় রাখতে পেরেছিল।

ঐতিহাসিক মহলে শ্যামদেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতা বজায় কারণ নিয়ে মতভেদ দেখা যায়। বলা হয়ে থাকে এই স্বাধীনতা কি থাই রাজতন্ত্রের দ্বারা আদৌ বজায় রাখতে পারা গিয়েছিল নাকি ব্রিটিশ ও ফরাসিরা পরিকল্পিতভাবে শ্যামদেশকে buffer state-এ পরিণত করে রেখেছিল বলে তার স্বাধীনতা বজায় ছিল।

৬৭.৩ শ্যামদেশে চক্রী রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা

অষ্টাদশ শতকে ব্রহ্মদেশের আক্রমণে থাইল্যান্ডের ইতিহাসে আয়ুধায়া রাজতন্ত্রের পর্যায়টি সমাপ্ত হয়। ১৭৮২ সালে চাওফায়া চক্রী নামক সেনাপতির নেতৃত্বে ব্যাংককে প্রতিষ্ঠিত হয় চক্রী রাজতন্ত্র। তিনি পরবর্তীকালে 'রাম' উপাধি নিয়ে রাজনৈতিক সংহতি ও সুবিচার এবং ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা করেন থাইল্যান্ডে। বস্তুতপক্ষে ঔপনিবেশিক আগ্রাসনের সময়কালে চক্রী রাজতন্ত্র ও সুদক্ষ রাজকর্মচারীদের সুযোগ্য নেতৃত্ব লাভ করে থাইল্যান্ড নিজ রাষ্ট্রে এক নতুন যুগের সূচনা করে।

৬৭.৩.১ চক্রী রাজতন্ত্রের বাস্তবমুখী নীতি

পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলির আগ্রাসনের বিপদ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সর্বত্রই দেখা গিয়েছিল। পাশ্চাত্যের এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করার মতো মানসিকতা কোন রাজতন্ত্রেরই ছিল না থাই চক্রী রাজবংশ ছাড়া। বস্তুপক্ষে পশ্চিমী প্রভাব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছিল এবং তার গঠনমূলক দিকটিকে উপেক্ষা না করে রাষ্ট্রের উন্নয়নে কাজে লাগিয়ে চক্রী রাজবংশ থাইল্যান্ডে পরিবর্তন নিয়ে আসে এবং ইউরোপীয় চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে সক্ষম হয়। বিপরীতভাবে ব্রহ্মদেশের রাজতন্ত্র ও সরকারি কর্মচারীরা পশ্চিমের এই অচেনা প্রভাবকে স্বীকার করতে পারেনি এবং তাকে প্রতিরোধ করার জন্য নিজ রাষ্ট্রীয় পন্থা অবলম্বন করেছিল যা ব্রিটিশ বাহিনীর সামনে ছিল নেহাৎই অপ্রতুল তাই ব্রহ্ম রাজতন্ত্রের পতন খুব সহজেই হয়ে গেল আর চক্রী রাজবংশ সেই উপনিবেশিক আগ্রাসনের যুগে ইউরোপীয় বিজ্ঞান, প্রযুক্তিকে রাষ্ট্রক্ষমতার অঙ্গ হিসাবে গ্রহণ করে নিজ মহিমায় দাঁড়িয়ে রইল।

আবার এটাও ঠিক, কোন সরকারি নথিপত্রে ব্রিটিশ ও ফরাসিদের মধ্যে কোন দ্বিপাক্ষিক চুক্তি সম্পাদনের তথ্য পাওয়া যায় নি যাতে করে এই মনে হতে পারে যে উভয় থাইল্যান্ডকে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিতে চেয়েছিল। ঊনবিংশ শতকে থাইল্যান্ড তার সার্বভৌমত্ব বজায় রাখলেও দুটি পশ্চিমী রাষ্ট্রের কাছে কিছু গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলের অধিকার ত্যাগ করেছিল।

৬৭.৩.২ উপনিবেশিকতার যুগে থাইল্যান্ডের ব্যতিক্রমী প্রকৃতি

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার থাইল্যান্ডে পশ্চিমী অনুপ্রবেশের পূর্বে মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। ১৫১২ সালে প্রথম এখানে এসে উপস্থিত হয় পর্তুগীজরা। তার প্রায় শতবর্ষ পরে ১৬০২ ও ১৬০৮ সালে ডাচ বা ওলন্দাজরা এখানে আসে। সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ব্রিটিশ ও শেষার্ধে ফরাসিরা থাইল্যান্ডে প্রবেশ করে। ১৬৬১ সালে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ইংরাজ কোম্পানির ফ্যাক্টরি স্থাপিত হয়। তবে কোন ফরাসি কুঠি বা ফ্যাক্টরি এখানে স্থাপিত হয়নি। ভারতবর্ষে যেমন শক্তিশালী রাজতান্ত্রিক ঐতিহ্য থাকা সত্ত্বেও বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ডে পরিণত হয়েছিল। থাইল্যান্ড ছিল তার ব্যতিক্রম। এখানে কিন্তু ব্রিটিশদের রাজদণ্ড প্রতিষ্ঠা হয়নি।

৬৭.৩.৩ থাইল্যান্ডে পরিবর্তনের সূত্রপাত

ব্যাংককে চক্রী রাজবংশ স্থাপনার (১৭৮২ খ্রিঃ) চার বছর পর ইউরোপীয়রা আবার থাইল্যান্ডে আসতে আরম্ভ করে। ইংরেজরা ইতিমধ্যে কেধা (Kedah) দ্বীপে, পেনাং-এ উপনিবেশ স্থাপন করেছে। আপনাদের সামনে ব্রহ্মদেশের রাজনৈতিক চিত্র উপস্থাপন করে বলা যেতে পারে ১৮২৫-এ ইয়ান্দাবু সন্ধি এবং তারপর আরো দুটি যুদ্ধে ব্রিটিশরা বর্মায় জয়লাভ করেছে। অন্যদিকে ফরাসিরা ভিয়েতনাম দখল করেছে উনবিংশ শতকের আগেই।

এইসব দ্রুত ঔপনিবেশিক বিস্তারের সামনে থাইল্যান্ড অসহায় ছিল তবে চতুর্থ রাম বা মোঙ্গকূট (Mongkut)-এর সময় থেকে শ্যামদেশে পরিবর্তনের সূচনা হয়। দেখা গেল মোঙ্গকূট পশ্চিমী নীতি (পরিবর্তনের প্রচেষ্টা অর্থাৎ ইউরোপীয় প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে রাষ্ট্রের উন্নয়নের প্রচেষ্টা) গ্রহণ করে পশ্চিমের আগ্রাসনকে ঠেকিয়ে রাখলেন। তাঁর পরবর্তী উত্তরাধিকারীরা যোগ্যতার সঙ্গে এই নীতিকে ধরে রেখেছিলেন। অর্থাৎ পশ্চিমী অনুপ্রবেশের পদগুলিকে রাষ্ট্রের প্রগতির জন্য কাজে লাগিয়ে ছিলেন।

৬৭.৩.৪ চক্রী রাজতন্ত্রের কৃতিত্ব

প্রথম রাম (১৭৮২-১৮০৯) তাঁর সময়কালে চক্রী রাজতন্ত্রকে সংহত ও সামাজিক, সাংস্কৃতিক পুনর্গঠন করেন। দ্বিতীয় রামের সময়কাল থেকে (১৮০৯-১৮২৪) পশ্চিমী চাপ তথা বাণিজ্যিক সুবিধা আদায়ের চাপ শুরু হয়। দ্বিতীয় রাম ব্রিটিশ বণিকদের সুনজরে দেখে নি। কেধা ছিল ব্যাংককের অধীনস্ত, ইংরেজরা এই অঞ্চল দখল করে নিলে তাদের প্রতি বিরুদ্ধ মনোভাব খুব স্বাভাবিকভাবে থাইবাসীদের মধ্যে জাগ্রত হয়েছিল। ১৮২৪ সালে ক্যাপ্টেন বার্নে (Burney)-এ নেতৃত্বে ব্রিটিশ মিশন বা দৌত্য ব্যাংককে আসে এবং ১৮২৬ সালে একটি বাণিজ্যিক চুক্তি সম্পন্ন হয় যাতে ব্রিটিশ বণিকরা ব্যাংকক বন্দরের সুবিধা, দক্ষিণ-পূর্ব মালয়ী উপদ্বীপ অঞ্চলের উপর বাণিজ্যিক সুবিধা লাভ করে। একইভাবে আমেরিকাও ১৮৩৩ সালে কিছু বাণিজ্যিক সুযোগ-সুবিধা আদায় করে নেয় কিন্তু দুটি রাষ্ট্রের মধ্যে কেউই থাইল্যান্ডে নিজ প্রতিনিধি রেখে বাণিজ্যিক পরিচালন ক্ষমতা লাভ করতে পারেনি। এখানেই চক্রী রাজবংশের কৃতিত্ব। উপদ্বীপের অঞ্চলগুলি যথানিয়মে থাই রাজতন্ত্রকে কর প্রদান করত, রাজকীয় নিয়ন্ত্রণ স্বীকার করত। আরো বিশদভাবে বলা যায় রাজকীয় নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হত চিনি, কাঠ, চাল, মশলার রপ্তানি বাণিজ্য। আলোচ্য সময়কালে থাই সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন তৃতীয় রাম (১৮২৪-১৮৫১)। তাঁর সময়েই সম্পাদিত হয়েছিল ১৮২৬ সালে চুক্তিটি। এই চুক্তিটিতে ব্যতিক্রমীভাবে থাই কর্তৃত্ব বজায় ছিল এবং কেধার ওপর থাই কর্তৃত্ব স্বীকৃত হয় এবং পেরাক ও সেলানগোর (Perak-Selangor)-এর স্বাধীনতা স্বীকৃত হয়। তবে মালয়ী অঞ্চল ট্রিংগানু, কেলানতন প্রদেশে স্বাধীনভাবে বাণিজ্য করার অধিকার পেয়েছিল ব্রিটিশরা।

৬৭.৩.৫ চতুর্থ রাম বা মঙ্কুটের সময়কাল

১৮২৪ সালে যখন দ্বিতীয় রামের মৃত্যু হয় তখন তাঁর পুত্র মংকুটের বয়স মাত্র উনিশ এবং তিনিই ছিলেন সিংহাসনের বৈধ উত্তরাধিকারী। তিনি তখন প্রথানুযায়ী মঠে পড়াশুনা করছিলেন। রাজসভার প্রভাবশালী গোষ্ঠীর কূটনীতির কারণে তাঁকে আরো সাতাশ বছর মঠে রাখা হয় ও তাঁর জ্ঞাতিভ্রাতা সিংহাসন লাভ করেন তৃতীয় রাম উপাধি নিয়ে। দীর্ঘ এই সাতাশ বছর তিনি গভীরভাবে ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন, ভাষা শিক্ষা করেছিলেন আর পালন করেছিলেন মঠের গণতান্ত্রিক, শৃংখলাপরায়ণ জীবনযাত্রা। ফলে নিজেকে তিনি রাজা নয় সাধারণ মানুষ বলে ভাবতে শিখেছিলেন, বাস্তববোধের জন্ম হয়েছিল তাঁর মধ্যে। থাই রাজতন্ত্র যতজন রাজাকে লাভ করেছে তার মধ্যে মঙ্গকূট ছিলেন সর্বাপেক্ষা বিদ্বান, বাস্তববুদ্ধি সম্পন্ন রাজা। ইউরোপীয় বণিকরাও এযাবৎ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার যত সুলতান, রাজার সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন তাদের মধ্যে মঙ্গকূট ছিলেন শ্রেষ্ঠ। তিনি তৎকালীন পৃথিবীর ঘটনালীর সম্পর্কে খবর রাখতেন। বিজ্ঞান, গণিত, কলা, জ্যোতিষশাস্ত্রে বিদ্যালাভ করেন এবং পাশ্চাত্ত্য প্রযুক্তি, অর্থনীতি, রাজনীতি, সামরিক শক্তির সম্যক ধারণা রাখতেন। তাঁর ধারণা হয়েছিল স্বরাষ্ট্রে সংস্কারের আবশ্যিক প্রয়োজন রয়েছে। ১৮৪২ সালে ইংরেজদের কাছে চীনের পরাজয়ের অভিজ্ঞতা থেকে তাঁর মনে এই ধারণা হয় যে দুর্বল থাইল্যান্ডের প্রথাগত সমাজ ও সরকার খুব বেশিদিন প্রচণ্ড উপনিবেশিক শক্তিকে এড়াতে পারবে না। মঠে জীবনযাপন কালে তাঁর এই অভিজ্ঞতাটিও হয়েছিল যে রাষ্ট্রের সনাতন ঐতিহ্যকে পশ্চিমী ভাবধারায় নিশ্চিহ্ন করা অনুচিত। থাই ঐতিহ্যে তিনি এক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন। তিনি গভীরভাবে বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন, পালি ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। তাঁর মনে ধারণা জন্মেছিল বৌদ্ধধর্মের সংগঠনে ও সংস্কার করা আশু প্রয়োজনীয় কারণ ধর্ম এই সময় আচার-অনুষ্ঠানভিত্তিক হয়ে ওঠে। ১৮৩৭ সালে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন নতুন আঙ্গিকে এক বৌদ্ধধর্ম সম্প্রদায় যার নাম ছিল ধম্মায়ুতিকা (Dhamma yutika)। তিনি আমেরিকান ও ফরাসি মিশনারীদের কাছ থেকে বিদ্যা আয়ত্ত করেন। ফলে তিনি যখন সিংহাসনে আরোহন করেন তখন বাস্তব সমস্যার সমাধানের জন্য তিনি তাঁর লব্ধপ্রতিষ্ঠ জ্ঞান, অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়েছিলেন এবং সফলও হয়েছিলেন।

১৮৫১ সালে তিনি চতুর্থ রাম উপাধি নিয়ে সিংহাসনে বসেন। এই সময় ইউরোপীয় ওপনিবেশিকবাদ প্রবল প্রতাপে প্রসারিত হচ্ছিল ভারত, চীন, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি অর্থনৈতিক শোষণে ভীষণভাবে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে পশ্চিমী হস্তক্ষেপ তিনি সহ্য করেননি তবে বাণিজ্য, যাতায়াত, যোগাযোগ, মুদ্রাব্যবস্থার ক্ষেত্রে পশ্চিমী রেওয়াজ গৃহীত হয়েছিল। যতটা সম্ভব পশ্চিমের প্রযুক্তিকে গ্রহণ করে রাষ্ট্রব্যবস্থা শক্তিশালী করাই হল একজন বাস্তববোধ সম্পন্ন রাজার লক্ষ্য।

চতুর্থ রাম (১৮৫১-১৮৬৮) ১৮৫৫ সালে স্যার জন বাওরিং নেতৃত্বে ব্রিটিশ বাণিজ্যিক দৌত্যকে সাদরে অভ্যর্থনা জানিয়ে সর্বপ্রকার বাণিজ্যিক সহযোগিতার আশ্বাস দিয়ে সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করালেন।

এই সন্ধির ফলে আমদানি-রপ্তানি সংক্রান্ত শুল্কনীতি স্থির করা হয়। নির্দিষ্ট পরিমাণ আফিং আমদানির উপর শুল্ক ছাড় দেওয়া হয়। আমদানি শুল্কের উপর ৩ শতাংশ ছাড় দেওয়া হয়। বেশি করের ভার থেকে ব্রিটিশদের রেহাই দেওয়া হয়। ব্যাংককে ব্রিটিশ রেসিডেন্ট রাখার অনুমতি দেওয়া হয় এবং থাইল্যান্ডে বসবাসকারী ব্রিটিশ নাগরিকের উপর তাদের দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচার করার ক্ষমতা দেওয়া হয়। এইভাবে বারোটি বিভিন্ন শর্তে মোটামুটিভাবে ব্রিটিশরা প্রায় অতিরাষ্ট্রিক অধিকারের সমতুল্য ক্ষমতা লাভ করে। পরের বছর আরো একটি চুক্তি করে পূর্ববর্তী চুক্তিগুলিকে সংশোধন করে নেওয়া হল। তবে এতসব সুবিধাদানের পশ্চাতে ছিল তোষামোদ করে প্রতারণা করা এবং সূক্ষ্মভাবে আবৃত ভয়ের প্রদর্শন। তাই একইভাবে ১৮৫৬-তে ফ্রান্সের সঙ্গে, ১৮৫৮-তে ডেনমার্কের সঙ্গে, ১৮৫৯ সালে পর্তুগালের সঙ্গে, ১৮৬০ সালে হল্যান্ডের, ১৮৬২ তে প্রাশিয়া এবং ইটালী, বেলজিয়াম, নরওয়ে, সুইডেন প্রভৃতি রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে সমানভাবে চুক্তি করে শ্যামদেশে বিদেশী বাণিজ্যিক উদ্যোগের রাস্তা খুলে দেওয়া হয়। এর একটাই উদ্দেশ্য ছিল সাবধানতা অবলম্বন যাতে কোন একটি রাষ্ট্র এককভাবে চূড়ান্ত ক্ষমতা অধিকারী হতে চাইলে বাকি রাষ্ট্রগুলি সমানভাবে তাকে প্রতিরোধ করবে।

৬৭.৩.৬ থাইল্যান্ডে নতুন যুগের সূচনা

১৮৫৫ সালের এই বাণিজ্যিক চুক্তিকে D.G. Hall বলেছেন "epoch-making"। বাস্তবিকপক্ষে এরপর থেকেই থাইল্যান্ডে নতুন যুগের সূচনা হয়। শুরু হল ব্যাপক আভ্যন্তরীণ সংস্কার যা চলেছিল মংকুটের পুত্র চুলালংকর্ণ-এর (Chulalongkorn) সময়কাল পর্যন্ত। রাষ্ট্রের প্রধান রূপে রাজার সুযোগ্য নেতৃত্বে শ্যামদেশ আধুনিক যুগে পদার্পণ করল। কিছু সামন্ততান্ত্রিক অধিকারকে লুপ্ত করে দেওয়া হল যেমন উচ্চ সরকারি কর্মচারীদের বিশেষ সুবিধা, রাষ্ট্রের কিছু একচেটিয়া অধিকার প্রভৃতি। শ্যামদেশে অর্থনৈতিক পরিবর্তন শুরু হয়েছিল তবে মংকুট তাঁর রাজনৈতিক বিচক্ষণতায় প্রাচীন সব অধিকারকে (বিশেষ করে অভিজাতদের) বিলোপ করেননি। থাইল্যান্ডে পশ্চিমী সংস্কৃতি অনুপ্রবেশ করল। পশ্চিমী শিক্ষক, প্রশিক্ষক, পরামর্শদাতা উপস্থিত হলেন শ্যামদেশে মংকুট তাই অভিজাতদের পশ্চিমী শিক্ষা প্রদানে সচেষ্ট হলেন। তিনি নিজেই পরিবর্তন নিয়ে এলেন। কিছু প্রাচীন রাজতান্ত্রিক রীতিনীতির ক্ষেত্রে পরিবর্তন এলো যেমন রাজার মুখ আবৃত করে রাখার রীতি তিনি তুলে দিলেন মংকুটের পূর্ববর্তী রাজাদের মন্দিরে পূজো দিতে যাবার বাৎসরিক রীতি রহিত করেন। তিনি রাজাদের জনসমক্ষে বের হবার রেওয়াজ শুরু করেন। এতে রাজার সঙ্গে প্রত্যক্ষ জনসংযোগ স্থাপিত হয়। এছাড়া জনগণ যাতে রাজার কাছে সরাসরি আবেদন জানতে পারে সেই ব্যবস্থাও চালু করেন। রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠা করেন জাহাজ তৈরির কারখানা। একাধিক উন্নতমানের সড়ক ও জলপথ চালু করেন। ১৮৬০ সালে রাজকীয় টাঁকশাল প্রতিষ্ঠা করেন। মংকুট তৈরি করান ছাপাখানা। বিদেসী ভাষা শিক্ষার জন্য অনেকগুলি প্রতিষ্ঠান চালু করেন।

৬৭.৪ চক্রীরাজ চুলালংকর্ণ-র সময় ঔপনিবেশিকতাবাদ

১৮৬৮ সালে মংকুটের স্থলাভিষিক্ত হলেন পঞ্চম রাম বা তাঁর পুত্র চুলালংকর্ণ। তাঁর শাসনকালে (১৮৬৮-১৯১০) কম্বোডিয়া সহ বেশ কয়েক মালয়ী অঞ্চলের উপর শ্যামের কর্তৃত্ব নষ্ট হয়ে যায়। এইভাবে ফ্রান্সের চাপে পড়ে থাইল্যান্ডের সীমা অনেকাংশে সঙ্কুচিত হয়ে যায়। অন্যতম থাই এলাকা লাওসের ওপর ফ্রান্সের দৃষ্টি ছিল অনেকদিন থেকেই কিন্তু মংকুট কূটনৈতিক দক্ষতায় শ্যামদেশে ফরাসি প্রটেকটোরেট স্থাপনের অধিকার দিয়েছিলেন। অধিকার নিঃশর্ত ছিল না। পশ্চিম কম্বোডিয়ার বাতমবাং (Battambang) ও সিয়ামরীপের (Siem Reap) ওপর থাই আধিপত্য ছিল। তাঁর মৃত্যুর পর ব্রিটিশদের ও বিশেষ করে ফরাসি অনুপ্রবেশের চাপ বৃদ্ধি পায়। ১৮৮৫ সালের মধ্যে টংকিন, আন্নাম ছাড়া কোচিন-চীন এবং কম্বোডিয়াতে ফরাসি আগ্রাসন সম্পূর্ণ হয় এবং লাওসের ওপর ফ্রান্সের লুব্ধ দৃষ্টি পড়ে। এই সময়ে ফরাসি কার্যকলাপ দেখে মনে হচ্ছিল তারা লাওসে প্রোটেকটোরেট স্থাপন করবে। এছাড়া টংকিনে অধিকার স্থাপন করে মেকঙের পশ্চিমে অগ্রসর হওয়া স্বাভাবিক ছিল। পশ্চিমে অগ্রসর হলে লাওসের উপর দাবি অনিবার্য হয়ে উঠত। ফ্রান্সের এই ধরনের দাবির ব্যাপারে থাইল্যান্ডের সন্দেহ হতে থাকে। থাইরাজ এই সন্দেহের ব্যাপারটি তাঁর ডায়েরীতে লিখেছেন ‘বর্তমান সময়ের সবচেয়ে বড় সমস্যাটি হলো আমাদের রাষ্ট্রকে রক্ষা করা ..... আজকের দিনে আমাদের বামে রয়েছে ব্রিটেন এবং ডানদিকে ফ্রান্স...’ এই অবস্থায় প্রয়োজন ছিল বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের কূটনীতি এবং প্রতিরোধের। তবে থাইল্যান্ডের সঙ্গে ব্রিটেনেরই বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। থাই-ফরাসি সম্পর্কের অনেকটা সংঘর্ষমূলক হয়ে গেল ১৮৯৩ সালে। লাওসকে নিয়ে অনেকদিন ধরেই রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা চলছিল। এবার শ্যামদেশকে অধীনস্ত করার জন্য ফরাসি রণপোত শ্যামের চাও ফারিয়া (Chao Pharaya) জলবিভাজিকার মুখে অবরোধ সৃষ্টি করে শ্যামের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বাধা সৃষ্টি করে। মেকঙের পশ্চিম তীর থেকে থাহ সেন্য প্রত্যর্পণের জন্য চরমপত্র পেশ করে ফ্রান্স। দুদিন অবরুদ্ধ থাকার পর থাইল্যান্ড ফ্রান্সের দাবি মেনে নেয় এবং ১৮৬৭ সালে অধিকৃত বাতামবাং ও সিয়েমরীপ ফরাসিদের হাতে তুলে দেয়।

এই সময়ে ব্রিটেনের পক্ষ থেকে মৌখিক আশ্বাস ছাড়া থাইল্যান্ডের প্রতি অন্য কোন সহযোগিতা করতে দেখা যায়নি। ঔপনিবেশিক স্বার্থে ফরাসি আগ্রাসনকে ভালো নজরে দেখেনি কিন্তু এই সময়ে ব্রিটেন কোন সরাসরি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে চায়নি।

৬৭.৫ শ্যামদেশে উপনিবেশিকতাবাদের ফলাফল

এরপর ১৯০৪ ও ১৯০৭ সালের চুক্তি দ্বারা ফ্রান্স লাওস এবং কম্বোডিয়ার ওপর অধিকার লাভ করে। ১৯০৭ সালে সম্পাদিত হয় ইঙ্গো-থাই চুক্তি যাতে ব্রিটেন লাভ উত্তরে মালয়ের চারটি সমৃদ্ধ রাজ্য যেমন কেলানতন (Kelantan), কেধা (Kedah), পেরলিস (Perlis), এবং ত্রেংগানু (Trengganu)। এখান থেকে থাই কর্তৃত্ব বিলুপ্ত হয়। এইভাবে ব্রিটিশ আধিপত্য করা বা ‘ক্রা’ যোজক (Kra Isthmus) পর্যন্ত বিস্তৃত হল।

১৯০৯ সালে শ্যামদেশে ব্রিটিশ ও ফরাসিদের বাফার রাজ্যে পরিণত হয়ে যায়। বিশাল ভূখণ্ড (Mainland country) থাইলরান্ড ধীরে ধীরে সংকুচিত হয়ে যায়। বিদেশীদের বহু অতিরাষ্ট্রিক অধিকার দান করতে বাধ্য হয়। এইভাবে থাইল্যান্ড বহু গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে অধিকার ত্যাগ করে। এখান থেকে সার্বভৌম অধিকারও ছেড়ে দিতে হয়। তবে শ্যামের স্বাধীনতা কিন্তু অক্ষুণ্ণ ছিল। যদিও আয়তনে ক্ষুদ্র হলেও সময়কালীন যুগে আফ্রিকা ও এশিয়ার বিভিন্ন অংশের ঔপনিবেশিক দুর্দশার মাঝে থাইল্যান্ড বা শ্যামদেশের অবস্থিতি অবশ্যই কিছুটা গর্বের বিষয় ছিল। উপরিউক্ত আলোচনা সত্ত্বেও একথা বলা যায় ব্রিটেন ও ফ্রান্সের স্বার্থপর বদান্যতা শ্যামদেশের স্বাধীনতাকে টিকিয়ে রেখেছিল। বাস্তবিক পক্ষে শ্যামদেশে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের আধা উপনিবেশে পরিণত হয়েছিল।

৬৭.৬ সারাংশ

ঔপনিবেশিক বিস্তারের সময়কালে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয় উপদ্বীপ অঞ্চলের রাষ্ট্রগুলির মধ্যে একমাত্র শ্যামদেশ বা থাইল্যান্ডের স্বাধীনতা বজায় ছিল। সর্বত্রই দেখা গিয়েছিল বিদেশী আগ্রাসন অথচ শ্যামদেশের শক্তিশালী বাস্তবমুখী রাজতন্ত্র এই আগ্রাসনকে অনেকখানি নিয়ন্ত্রিত রেখেছিল। চক্রী রাজতন্ত্র রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে গ্রহণ করেছিলেন বিবিধ জনকল্যাণমুখী সংস্কার। অর্থনৈতিক দিক থেকে রাষ্ট্রকে প্রগতিশীল করে তুলে এবং সমৃদ্ধি নিয়ে এসে শ্যামদেশকে আর্থিক ক্ষেত্রে শক্তিশালী করে তুলেছিলেন। বস্তুতপক্ষে এই শক্তিশালী আর্থিক কাঠামো রাষ্ট্রকে স্বাধীন রাখার ক্ষেত্রে শক্তি যুগিয়েছিল। চক্রী রাজারা এটাও উপলব্ধি করেছিলেন যে কোন একটি পশ্চিমী শক্তির সঙ্গে সম্পর্ক রাখলে সেই শক্তির অতিরিক্ত প্রভাব থাই স্বাধীনতার পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে। এইজন্য একাধিক রাষ্ট্রকে শ্যামদেশে আমন্ত্রণ জানিয়ে কিছুটা জাপানের কায়দায়, তাদের পারস্পরিক বিবাদের সুযোগ নিয়ে চক্রী রাজারা থাইল্যান্ডের স্বাধীনতা বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন।

৬৭.৭ অনুশীলনী

ক। বিষয়মুখী প্রশ্ন

১। থাই বা তাই শব্দের অর্থ কি?

২। থাইল্যান্ডের প্রাচীন রাজধানীর নাম কি লিখুন।

৩। থাইল্যান্ডে কোন প্রাণী রাজকীয় মহিমার প্রতীক ছিল?

৪। চক্রী রাজতন্ত্র কোথায়? কত সালে এবং কে প্রতিষ্ঠা করেন?

৫। চক্রী রাজাদের উপাদি কি ছিল?

৬। থাইল্যান্ডের রপ্তানি বাণিজ্যের পণ্যগুলি কি কি?

৭। শ্যামের জলবিভাজিকার নাম উল্লেখ করুন।

খ। সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্ন

১। উপনিবেশবাদের যুগে শ্যামের রাজনৈতিক অবস্থিতি কী রূপ ছিল?

২। চক্রী রাজতন্ত্রের প্রকৃতি কেন ব্যতিক্রমী ছিল?

৩। ১৮৫৫ সালের চুক্তিকে কেন 'epoch making' বলা হয়?

৪। উপনিবেশবাদের যুগে চক্রী রাজতন্ত্রের স্বাধীনতা কী প্রকৃত স্বাধীনতা ছিল?

গ। দীর্ঘ উত্তরে প্রশ্ন

১। রাজা মংকুটের সময়কালে চক্রী রাজতন্ত্রের অগ্রগতি বর্ণনা করুন।

২। থাই অগ্রগতি চুলালংকর্ণ'র সময়ে কতটা বজায় রেখেছিল"— আলোচনা করুন।

৩। "ব্রিটিশ ও ফ্রান্সের স্বার্থপর বদান্যতা থাইল্যান্ডের স্বাধীনতা বজায় রেখেছিল"— আলোচনা করুন।

৬৬.৮ গ্রন্থপঞ্জী

1. Hong Lysa—Thailand in the Nineteenth Century. Institute of South Asia Studies 1994.
2. D.R. Sardesai—South-East Asia—past and Present. Vikas Pulishing 1981.
3. Kailash K. Beri—History and Culture of South-East Asia. Starling Publishers 1994.
4. Milton Osborne—South-East Asia—An Introductory History.
5. D.J.M. Tate—Making of Modern South-East Asia.

একক ৬৮ ❑ ফিলিপিন দ্বীপপুঞ্জ ও ইন্দোচীনে পশ্চিমী উপনিবেশাদ ও প্রসার

গঠন

৬৮.০ উদ্দেশ্য

৬৮.১ প্রস্তাবনা

৬৮.২ ফিলিপিন দ্বীপে স্পেনীয় আধিপত্যের সূচনা

  ৬৮.২.১ ফিলিপিনে স্পেনীয় বাণিজ্য

  ৬৮.২.২ ফিলিপিনের সমাজ ও বাণিজ্যে ইসলামের প্রভাব

  ৬৮.২.৩ স্পেনীয় আধিপত্যের সংহতিকরণ

  ৬৮.২.৪ ফিলিপিনে স্পেনীয় প্রশাসন

৬৮.৩ প্রাক্-ঔপনিবেশিক ফিলিপিনের ধর্মব্যবস্থা

  ৬৮.৩.১ ফিলিপিনের অর্থনৈতিক উন্নয়নে স্পেনের ভূমিকা

  ৬৮.৩.২ স্পেনীয় প্রসারণের প্রকৃতি

৬৮.৪ মিশনারীদের ভূমিকা

৬৮.৫ ফিলিপিনে স্পেনীয় প্রভাব

  ৬৮.৫.১ ফিলিপিন দ্বীপপুঞ্জে স্পেনীয় আধিপত্যের ফলাফল

  ৬৮.৫.২ দ্বীপপুঞ্জে বিদ্রোহের প্রসার

৬৮.৬ আমেরিকীয় শাসনের সূচনা ও ফলাফল

৬৮.৭ ইন্দোচীনে ফরাসি অনুপ্রবেশ

  ৬৮.৭.১ ফরাসি মিশনারীদের সক্রিয়তা

  ৬৮.৭.২ ইন্দোচীনের রাজতন্ত্র ও ফরাসি সম্পর্ক

  ৬৮.৭.৩ গিয়াল্যাং রাজতন্ত্র ও সমাজ সংস্কার

  ৬৮.৭.৪ ইন্দোচীনের পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতি

৬৮.৭.৫ ফরাসি আধিপত্য প্রসারণের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা
৬৮.৮ ইন্দোচীনের রাজতন্ত্রের বিরোধিতা
৬৮.৮.১ ইন্দোচীনের যুদ্ধ ও কোচিন-চীনের অধিকার
৬৮.৮.২ কম্বোডিয়া দখল
৬৮.৮.৩ লাওস অধিকার
৬৮.৮.৪ থাই-ফরাসি প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও সমগ্র ইন্দোচীনে ফরাসি অধিকার স্থাপন
৬৮.৯ সারাংশ
৬৮.১০ অনুশীলনী
৬৮.১১ গ্রন্থপঞ্জী

৬৮.০ উদ্দেশ্য

ফিলিপিন দ্বীপপুঞ্জ ও ইন্দোচীনে স্পেনীয় ও ফরাসি ঔপনিবেশিকতাবাদের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য ছিল। এককটি পাঠ করে আপনি নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি জানতে পারবেন—

- ফিলিপিন দ্বীপপুঞ্জে স্পেনীয় বাণিজ্য ও বাণিজ্যিক সংহতিকরণ।
- স্পেনীয় শাসনের নির্মম প্রকৃতি।
- সমাজজীবনে অসন্তোষ ও বিদ্রোহের বিস্তার।
- ইন্দোচীন রাজতন্ত্রের ইউরোপীয় বিরোধী মনোভাব।
- ফরাসি একাধিপত্য স্থাপনের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা।
- স্পেনীয় ও ফরাসি মিশনারীদের সক্রিয়তা।
- ফিলিপিনে স্পেনীয় শাসনের অবসান ও আমেরিকার শাসনের সূচনা।

৬৮.১ প্রস্তাবনা

ফিলিপিন দ্বীপপুঞ্জে ঔপনিবেশিক প্রসারণবাদের সময়কালে অনিবার্যভাবে উপস্থিত হয়েছিল পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গ। যদিও এখানে প্রাচীনকাল থেকে সমাজব্যবস্থায় চীনাদের আধিপত্য ছিল, এছাড়াও ছিল ইসলামীয় ও ভারতীয় সভ্যতার প্রভাব। তবে স্পেনীয় আধিপত্যের সময়কালে ফিলিপিনের সমাজ, বাণিজ্য ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিবর্তনের সূচনা হয়। স্পেনীয় শাসনের পর ফিলিপিনে আমেরিকীয় শাসনের সূত্রপাত হয়। দুটি পাশ্চাত্য শক্তির প্রভাবে এখানে সামগ্রিকভাবে যে পরিবর্তন আসে তা এখানকার জাতীয়তাবাদী চেতনা প্রসারণের এবং একাধিক বিদ্রোহের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দ্বীপ অঞ্চল ছাড়া মূল ভূখণ্ড অঞ্চলেও পশ্চিমীশক্তির সমাবেশ হয়েছিল। ইন্দোচীনে শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল ফরাসিরা। ফরাসিরা অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে অন্যান্য পশ্চিমী রাষ্ট্রের আগ্রাসনের পথ এখানে রুদ্ধ করে রেখেছিল। শেষ পর্যন্ত সমগ্র ইন্দোচীনে ফরাসি আধিপত্য প্রতিষ্ঠা হয়েছিল।

৬৮.২ ফিলিপিন দ্বীপে স্পেনীয় আধিপত্যের সূচনা

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে স্পেনীয় আধিপত্যের সূচনা হয় ১৫৬৫ সালে। যদিও ইতিপূর্বে প্রায় চল্লিশ বছর আগে ম্যাগেলান এই পথে এসেছিলেন কিন্তু স্পেনীয়রা আমেরিকাতেই নিজেদের সীমাবদ্ধ রেখেছিল। ১৫৬৫ সালে মিগুয়েল লোপেজ ডি লেগাসপি একটি ছোট জাহাজ প্রায় চারশত স্পেনীয়দের সঙ্গে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার Cebu-তে এসে উপস্থিত হলেন। মেক্সিকো থেকে তৎকালীন স্পেন সম্রাট দ্বিতীয় ফিলিপের সম্মানার্থে এই উপদ্বীপের নামকরণ করা হয় ফিলিপিন্স। মেক্সিকো ও ফিলিপিনের সংয়োগ ঊনবিংশ শতক পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। ফিলিপিন্স দ্বীপপুঞ্জ যেন পশ্চিম গোলার্ধের স্পেনীয় সাম্রাজ্যের অতিরিক্ত একটা অংশ হয়ে উঠেছিল।

৬৮.২.১ ফিলিপিনে স্পেনীয় বাণিজ্য

প্রাচ্য অভিযানের মূলেই ছিল সুগন্ধী মশলার আকর্ষণ। তবে ফিলিপিনে বাণিজ্যঘাঁটি স্থাপন করাটা স্পেনীয়দের পক্ষে আর্থিক দিক থেকে তেমন একটা লাভজনক ছিল না। কারণ এখানে মশালার উৎপাদন হত না আর সম্পদের অন্য কোন উৎসও এখানে ছিল না। মানিলা ছিল চীনা সিল্ক ও অন্যান্য চীনা পণ্যদ্রব্যের বাণিজ্যক্ষেত্র তাই Cebu থেকে মানিলাতে স্পেনীয় বাণিজ্যকেন্দ্রটি স্থান পরিবর্তন করে ১৫৭১ সালে। একানে সিল্ক, চন্দন কাঠ ও মশলা এবং অন্যান্য ক্রান্তীয় উৎপাদন দ্রব্য বিনিময়ে বাজার গড়ে ওঠে। মানিলার অবস্থান ছিল বাণিজ্যিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। এখানকার বন্দরে আসত চীনা বাণিজ্যতরী ও ফিলিপিনের দক্ষিণ থেকে বাণিজ্যিক নৌকাগুলিও এখানকার বন্দরে আশ্রয় নিত। তাই মানিলা হয়ে উঠেছিল ফিলিপিনের মুখ্য বাণিজ্যকেন্দ্র।

৬৮.২.২ ফিলিপিনের সমাজ ও বাণিজ্যে ইসলামের প্রভাব

মানিলাতে দক্ষিণ ফিলিপিন্স থেকে বেশিরভাগ মুসলমানরাই আসত বাণিজ্য করতে। এদের মুর বলা হত। এই মোরে (Moor/Moro)-দের সঙ্গে স্পেনীয়দের ছিল বহু প্রাচীন প্রতিদ্বন্দ্বিতা। মানিলার উপকূলে স্পেনীয় বাণিজ্যের মূলে কাজ করেছিল দুটি প্রয়োজন। প্রথমত, এই বিশাল বাণিজ্য উপকূল থেকে মুসলমানদের বিতাড়ন। দ্বিতীয়ত, এই মুসলমানদের বাণিজ্যক্ষেত্র থেকে বহিষ্কার করে চীনা বাণিজ্যদ্রব্যের উপর স্বাভাবিক অধিকার স্থাপন করতে পারলে এই বাণিজ্যদ্রব্য স্পেনীয় অভিজাতমণ্ডলী (grandess) ও মহিলাদের কাছে অত্যন্ত লাভজনক চড়া মূল্যে বিক্রি করে লাভবান হবার প্রচেষ্টা দেখা যায়। চীনা বণিকরাও অনেক প্রকার বিলাসদ্রব্য, সূক্ষ্ম ভোগ্যপণ্য যেমন পোর্সেলিনের বাসনপত্র প্রভৃতির ব্যবসায়ে খুবই আগ্রহী ছিল।

এখানকার সমাজব্যবস্থায় খুব দ্রুততার সঙ্গে ইসলাম ধর্ম ঢুকে পড়েছিল। মিন্দানাও ও পালাওয়ানের কিছু কিছু অংশে ছড়িয়ে গিয়েছিল ইসলাম ধর্ম তবে স্পেনীয় প্রসারণের সময়ে লুজন (Luzon) ও বিসায়াসের (Visyas)

উপর প্রভাব কিছু ছিল না। ফিলিপিনের অপর বৈশিষ্ট্য হল এখানে প্রচলিত ছিল স্থানীয় রাজনৈতিক কাঠামো ও বাণিজ্যিক জীবনযাত্রা। স্থানীয় রাজনীতি ও বাণিজ্য ছিল ফিলিপিনের প্রাথমিক রাষ্ট্রীয় উপাদান। ফিলিপিনে, কেন্দ্রীয় রাজশক্তির অভাবে বাণিজ্যপথে বন্দর শহরগুলিতে ও লোকালয়ে ইসলাম ধর্ম প্রসারিত হচ্ছিল। বণিক ও বাণিজ্যকেন্দ্রের পরিচালকরা এই ব্যাপারে অংশ নিতেন। তাই বাণিজ্যসূত্রে যেমন ইসলাম ধর্ম ঢুকে পড়ল তেমনই কেন্দ্রীয় শক্তির অভাবে স্পেন অতি দ্রুত ফিলিপিনে বাণিজ্যিক প্রসারণ ও রাজনৈতিক আধিপত্য স্থাপন করে।

৬৮.২.৩ স্পেনীয় আধিপত্যের সংহতিকরণ

ফিলিপিনের নিম্নভূমিতে চাষযোগ্য অঞ্চল নিয়ে কোন বড় রাজ্য ছিল না এবং পার্বত্য অঞ্চলে কোন বড় জাতিগোষ্ঠীও ছিল না। জ্ঞাতিত্ব নির্ভ করত কৃষক ও মৎসজীবীদের তৈরি ছোট দলগুলির উপর। এই ছোট দলগুলিই স্থানীয় রাজনীতি নির্ধারণ করত। এই স্থানীয় রাজনীতিক দলগুলিকে বলা হত বারাঙ্গে (Barrangay)। একটি বারাঙ্গে দুইশত থেকে দুই হাজার স্থানীয় মানুষ নিয়ে তৈরি হত। যার শীর্ষে থাকতেন Datu বা একজন দলপতি (Clansman)। ফলে ফিলিপিনে কোন উচ্চ প্রশাসনিক বা রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের অভাব ছিল না। এই ছোট ছোট বরাঙ্গের মধ্যে পারস্পরিক একতা, সহযোগিতার পরিবর্তে ছিল সন্দেহ, অবিশ্বাস, শত্রুতা। এই বিকেন্দ্রীকৃত বিচ্ছিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামো স্পেনীয়দের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারেনি।

তাই প্রায়শই প্রতিরোধমূলক প্রবণতা কখনও বা নিষ্ক্রিয়তা কিংবা যুদ্ধ সংঘটিত হত স্থানীয় স্তরে। বরাঙ্গের পক্ষ থেকে স্পেনীয়দের বিরুদ্ধে কখনোই ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তোলা হয়নি। ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধের ক্ষেত্রে বারাঙ্গেদের অক্ষমতা স্পেনীয় শাসন ও ধর্মকে খুব দ্রুত প্রসারে সাহায্য করে। তবে দক্ষিণভাগের মুসলমান ও দুর্গম পার্বত্য প্রদেশের মানুষরা স্পেনীয়দের চাপিয়ে দেওয়া অর্ধদাসত্ব ও ব্যাপটাইজড হওয়া থেকে রেহাই পেয়ে গিয়েছিল।

৬৮.২.৪ ফিলিপিনের স্পেনীয় প্রশাসন

ফিলিপিন্সের বিজিত অঞ্চলগুলিকে স্পেনীয়রা প্রশাসনিক এককে বিভক্ত করে তার নাম দিয়েছিল এনকোমিয়েন্ডাস (Enconomiendas) এবং রাজকীয় আদেশানুসারে তার প্রধানকে বলা হত এনকোমেন্ডারো (Encomerdero)। একটি এনকোমিয়েন্ডার অধীন কৃষক সম্প্রদায়গুলির মানুষরা বার্ষিক খাজনা হিসাবে পণ্যদ্রব্য ও কায়িক শ্রম দানে বাধ্য থাকত এবং এনকোমেন্ডা তার অধীনস্থদের সুরক্ষা প্রদান ও তাদের মধ্যে ব্যাপ্টিস্ট ধর্ম প্রসারের কাজ করতেন। এরা হতেন সাধারণত প্রবীণ স্পেনীয় বিজেতা, যাঁরা পুরস্কারস্বরূপ এই এনকোমিয়েন্ডাস লাভ করতেন। বহু সংখ্যক ফিলিপিনো জেলাগুলির সম্পদ ব্যবহার করা হত উপনিবেশিক স্পেনীয় সৈন্য প্রতিপালনের জন্য। তবে সম্পদের অপব্যবহারও হত বহু পরিমাণ। এনকোমাডো তাঁর ব্যক্তিগত প্রয়োজনে প্রয়োজনের অধিক ব্যয় করতেন। বারাঙ্গে দলপতিও নিজস্থান রক্ষার্থে অসাধু উপায় নিতেন। এই ব্যবস্থায় সর্বাপেক্ষা বেশি নিপীড়নমূলক দিকটি

ছিল এনকোমেন্ডারো তাঁর অধীনস্থদের উদ্বৃত্ত ফসল নির্দিষ্ট মূল্যে তাঁর কাছে বিক্রি করতে বাধ্য করতেন। এতে কৃষকদের দারিদ্র্য আরো বাড়ত কারণ উদ্বৃত্ত ফসলের লভ্যাংশ তাদের কাছে পৌঁছাত না।

৬৮.৩ প্রাক্-ঔপনিবেশিক ফিলিপিনের ধর্মব্যবস্থা

সপ্তদশ সতাব্দীর সূচনায় লুজন ও বিসায়াসের উপকূল ও নিম্নভাগের জনগণের মধ্যে ধর্মান্তকরণের জোয়ার আসে। এখানে অর্থাৎ প্রাক্-ঔপনিবেশিক ফিলিপিনে কোন প্রতিষ্ঠিত ধর্মব্যবস্থা ছিল না(ছিলেন না পুরোহিত গোষ্ঠী। এখানকার মানুষ মাটি, পাথর প্রকৃতিকে দেবতা রূপে পূজা করতেন। তাই কোন পুরোহিত শ্রেণী এখানে গড়ে উঠতে পারেনি। ফলে স্পেনীয় মিশনারীদের ধর্মনৈতিক কোন প্রতিরোধের মুখোমুখি হতে হয়নি।

৬৮.৩.১ ফিলিপিনের অর্থনৈতিক উন্নয়নে স্পেনের ভূমিকা

সাম্রাজ্যের অকারণ প্রসারও সাম্রাজ্য রক্ষায় সহায়তা করতে পারে না। যেমনটি দেখা গিয়েছিল সপ্তদশ শতকের সূচনায় পর্তুগীজ সাম্রাজ্যের পতনের ক্ষেত্রে। আমেরিকায় সম্পদ আহরণের ক্ষেত্রে যে উদ্যম স্পেনীয়রা প্রদর্শন করেছিল তার সামান্যতমও ফিলিপিনের অর্থনৈতিক সংগটনের ক্ষেত্রে দেখা যায়নি ফলে সমগ্র দ্বীপপুঞ্জ নিষ্ক্রিয় হয়ে রইল। অর্থনৈতিক প্রগতি, রাজনৈতিক জাগরণ প্রভৃতি আরো কয়েকশ বছর পিছিয়ে গেল। এই দ্বীপপুঞ্জ স্পেনীয় সাম্রাজ্যের একটা Outpost হিসাবে রয়ে গেল। অবশ্য উপনিবেশের ক্ষেত্রে যে রাজকীয় নীতিগৃহীত হয়েছিল তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি ছিল ব্যক্তিগত সম্পদ আহরণে উৎসাহ দানে বিরত থাকা ও সাম্রাজ্যের প্রয়োজনে উপনিবেশকে ব্যবহার করা। ফলে বহু ক্ষেত্রে উপনিবেশগুলি অবহেলিত হত।

৬৮.৩.২ স্পেনীয় প্রসারণের প্রকৃতি

ফিলিপিনে স্পেনীয় প্রসারণ ছিল খুব ধীরগতির এবং তা অসম্পূর্ণও ছিল। কারণ দক্ষিণে ফিলিপিনে স্পেনীয় আধিপত্য স্বীকৃত হয়নি। অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগের মধ্যে উত্তর ফিলিপিনের নিম্নভূমি অঞ্চলগুলিতেই স্পেনীয় আধিপত্য প্রসারিত হতে পেরেছিল। দক্ষিণ ফিলিপিনের মুসলিম প্রধান ও সুলতান শাসিত অঞ্চলগুলি তাদের পৃথক অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল। দক্ষিণভাগের কিছু বড়ো অঞ্চল যেমন জামবোয়াঙ্গে (Zamboanga) প্রভৃতি স্থানে স্পেনীয় কর্তৃত্ব প্রসারিত হয় কিন্তু Sulu, Mindanao-র সুলতানরা স্পেনের অধীনস্ত হননি। বলা যায় অনেক আগে থেকেই মুসলিম বিভেদের বীজ এখানে ছড়িয়ে যায়।

৬৮.৪ মিশনারীদের ভূমিকা

ফিলিপিনে স্পেনীয় প্রসারণের অতিরিক্ত বিষয়টি ছিল ক্যাথলিক ধর্মের প্রসার। ঐতিহাসিক John L. Phelon যাকে “Philippinization of Spanish Catholicism” অর্থাৎ স্পেনীয় ক্যাথলিক ধর্মে ফিলিপিনোকরণ বলেছেন।

এশিয়ার মূল ভূখণ্ডে এখান তেকে ক্যাথলিক ধর্মের প্রসারলাভ করে। ১৫৭১ থেকে ১৮৯৮ এই সময়কালে ফিলিপিন ছিল একমাত্র এশিয় রাষ্ট্র যেখানে সবচেয়ে বেশি খ্রিস্টধর্মাবলম্বী মানুষ ছিলেন এবং যারা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্য যে কোন অঞ্চলের তুলনায় ছিলেন অনেক বেশি পাশ্চাত্য প্রভাবে প্রভাবিত। এখানে চার্চ ও যাজকের ভূমিকা ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তাঁরা ফিলিপিনের তাগালোগ (Tagalog) ভাষা ও অন্যান্য স্থানীয় কথ্যভাষা শিক্ষা করেছিলেন যাতে স্থানীয় ভাষায় তাঁরা খ্রিস্টধর্মের খুঁটিনাটি জনগণকে জানাতে পারেন। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে প্রাচীন কলেজটি তাঁরাই প্রতিষ্ঠা করেন (১৬১১ সালে সেন্ট থমাস কলেজ যা পরে, ১৬৪৫ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়)।

ম্যানিলাতে চার্চ ও যাজকের ভূমিকার কথা প্রসঙ্গে প্রখ্যাত ব্রিটিশ পর্যটক স্যর জন বোরিং (Sir John Bowring)-এর উক্তি উল্লেখ করা যেতে পারে "গভর্নর জেনারেল আছেন দূরে মানিলাতে(রাজা আছেন স্পেনে(এবং ঈশ্বর রয়েছেন স্বর্গে(কিন্তু যাজকরা আছেন সর্বত্র।" বস্তুতপক্ষে চার্চের প্রতিনিধি হিসাবে যাজকরা ছিলেন সর্বদ্যিমান এবং জনসাধারণের প্রাত্যহিক জীবনের উপর তাঁদের কর্তৃত্ব ছিল সাংঘাতিক। চালর্স এলিয়ট তাঁর দি ফিলিপিন্স গ্রন্থে বলেছেন, **"The key to the early history Phillippines is Found in the missionary character of the enterpeise."**

৬৮.৫ ফিলিপিনে স্পেনীয় প্রভাব

বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখলে যে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে তা হল স্পেনীয় শাসন উত্তর ফিলিপিনে একটি নতুন সামাজিক কাঠামো প্রস্তুত করেছিল। প্রাক্-ঔপনিবেশিক গ্রামীন কাঠামোর উপর তৈরি হয়েছিল এক বিদেশী ব্যবস্থা (non-indegenous system)। তবে স্পেনীয়রা যাবতীয় স্থানীয় বিষয় নাকচ করেছিল ভাবা সঠিক নয়। আবার এটাও ঠিক যে প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মনৈতিক যে রূপরেখা স্পেনীয়া তৈরি করেছিল তার প্রভাবও গভীর ছিল।

ফিলিপিনে স্পেনীয় ক্যাথলিক ধর্ম সংখ্যালঘুদের ধর্ম হবার পরিবর্তে হয়ে উঠেছিল সমগ্র উত্তর ফিলিপিনের ধর্ম। এখানকার গ্রামীন সামাজিক জীবনে স্পেনীয় মিশনারীরা অনেক তাৎক্ষণিক পরিবর্তন এনেছিলেন। স্পেনীয় উপনিবেশিক শাসনের প্রভাব কৃষকসমাজকে স্পর্শ করেছিল এবং প্রথাগত স্থানীয় দলপতিরা লাভ করেছিলেন কিছু নতুন ও অতিরিক্ত ক্ষমতা। উনবিংশ শতকের সূচনায় কিছু স্থানীয় ফিলিপিনো গোষ্ঠীর উদ্ভব হয় যারা স্পেনীয় শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষিত ছিলেন এবং রাষ্ট্রনৈতিক ও ধর্মীয় ব্যবস্থায় ভূমিকা পালনের যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন। বলা যায় এরা ছিলেন স্পেনীয় উপনিবেশিক ব্যবস্থায় একটি শিক্ষিত গোষ্ঠী। কিন্তু তাদের এই যোগ্যতা অস্বীকৃত হয় কারণ তারা জাতিসূত্রে স্পেনীয় ছিলেন না।

৬৮.৫.১ ফিলিপিন দ্বীপপুঞ্জে স্পেনীয় আধিপত্যের ফলাফল

বস্তুতপক্ষে তিনশত তেত্রিশ বছরে উপনিবেশিক শাসনকালে ফিলিপিনো জনগণের খুব নগণ্য ভাগই প্রশাসন, রাজনীতি ইত্যাদিতে অংশ নিতে পেরেছিলেন। এঁরাও যে আবার স্থানীয় জনগণের বিশেষ সাহায্য করতে

পেরেছিলেন তাও বলা যায় না। কারণ তাঁরা পুরোপুরি স্পেনীয় প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে থেকে কর্তব্য সম্পাদন করতেন। এছাড়া স্পেনীয় প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে যে বিশাল বাণিজ্য সম্পাদন হতো ম্যানিলা ও মেক্সিকোর বন্দর সহর আকাপালকোর (Acapulco) মধ্যে। এই লাভজনক ব্যবসায়ে ফিলিপিনোদের প্রবেশাধিকার ছিল না। এই গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক লভ্যাংশ চলে যেত পুরোপুরিভাবে স্পেনীয়দের হাতে। এইসব কারণ ধীরে ধীরে স্থানীয় মানুষের মনে বিরুদ্ধ মনোভাব সৃষ্টি করে। শুধু ফিলিপিনোরাই নয় ব্রিটিশ, ফরাসি, ডাচ কেউই এই বাণিজ্যে অংশ নিতে পারত না। ম্যানিলা-আকাপালকো বাণিজ্যপথে একাধিপত্য ছিল স্পেনীয়দের। বলা হয়ে থাকে স্পেনীয়রা প্রশান্ত মহাসাগরকে একটি স্পেনীয় হ্রদে পরিণত করে ফেলেছিল। ফিলিপিন উপদ্বীপকে স্পেনীয় বাণিজ্য (Gallon Trade) অন্য কোন রাষ্ট্রের কাছে নিষিদ্ধ করে রেখেছিল। এই দমবন্ধ অবস্থার হাত থেকে মুক্তি পেতে ফিলিপিনোরা আগ্রহী হলেও ঊনবিংশ শতক পর্যন্ত পরিস্থিতিকে মানিয়ে নিতে তারা বাধ্য ছিল।

৬৮.৫.২ দ্বীপপুঞ্জে বিদ্রোহের প্রসার

আলোচ্য সময়কালে অর্থাৎ স্পেনীয় উপনিবেশিক শাসনকালে ফিলিপিনে অনেকগুলি বিদ্রোহ সংঘটিত হতে দেখা যায়। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল জোস রিজাল (Jose Rizal)-এর নেতৃত্বে কাতিপুনান বিদ্রোহ। এই বিদ্রোহের নেতারা বহু সংস্কারধর্মী কার্যকলাপ নিয়েছিলেন। তবে অত্যন্ত দমননীতির দ্বারা ফিলিপিনের রাজনৈতিক কার্যকলাপের প্রয়াস রুদ্ধ করে দেওয়া হয়। ফিলিপিনে স্পেনীয় শাসনের বিরুদ্ধে অসন্তোষের জোয়ার আসে। স্থানীয় বিপ্লবী নেতারা স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্খায় এই অসহনীয় স্পেনীয় শাসনকে ছুঁড়ে ফেলে দেবার অপ্রশম্য আগ্রহে বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন। ১৮৪১-৪ সালে এবং ১৮৪৩ সালে বিদ্রোহের আগুন সর্বত্র ছড়িয়ে যায়। দমনমূলক নীতির দ্বারা বিদ্রোহী ব্যর্থ হলেও ১৮৬৯ সালে তা পুনরায় আত্মপ্রকাশ করে। এই সময়ে ফিলিপিনোদের উল্লেখযোগ্য দাবিগুলির মধ্যে ছিল আইনের চোখে স্পেনীয় ও ফিলিপিনোদের সমান অধিকার(বাক্-স্বাধীনতা, সভা-সমিতির অধিকার প্রভৃতি। সুয়েজ খালের উন্মোচনের ফলে পশ্চিমের উদারনৈতিক চিন্তাভাবনা খুব দ্রুতগতিতে ফিলিপিনের মানুষকে প্রভাবিত করছিল।

৬৮.৬ আমেরিকীয় শাসনে সূচনা ও ফলাফল

১৮৯৮ সালে স্পেনীয়-আমেরিকীয় যুদ্ধে স্পেনের পরাজয় ফিলিপিনের রাজনীতিতে পরিবর্তন আনে। ফিলিপিন্সের ঔপনিবেশিক শাসকের চরিত্র বদলে যায়। জনগণ স্পেনের পরিবর্তে আমেরিকার শাসনক্ষমতার নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। ১৮৯৯ সালে প্রথম ফিলিপিনো রিপাবলিক/সাধারণতন্ত্র স্থাপিত হয়। তাহলেও আমেরিকার শাসন এখানে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল যদিও ১৯৪১-১৯৪৫ পর্যন্ত এখানে জাপানী অধিকার স্থাপিত হয়েছিল।

দীর্ঘ কয়েক শতাব্দীর পশ্চিমী প্রশাসনের আওতায় ফিলিপিনের মানুষজদের মধ্যে পাশ্চাত্যকরণ হয়েছিল তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। বহু মানুষ ক্যাথলিক ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন। ফিলিপিন সমাজ সংস্কৃতিতে এসেছিল

পাশ্চাত্য রীতি রেওয়াজ। স্পেনীয় প্রশাসন এই উপদ্বীপ অঞ্চলকে রীতিমতো পশ্চিমী কায়দায় আধুনিক করে তুলেছিল। পশ্চিমী শিক্ষা এখানে জাতীয়তাবাদের প্রসারণ ঘটিয়েছিল। প্রশাসনের দৃঢ় কেন্দ্রীকরণ ছিল ফিলিপিনের স্পেনীয় প্রশাসনিক আওতায় তৈরি হয়েছিল প্রাদেশিক ও পৌর সাংগঠনিক এককগুলি। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ফিলিপিন দ্বীপপুঞ্জে। এই ব্যবস্থা তাকে অন্যান্য উপনিবেশের থেকে পৃথক সত্তা দান করেছিল।

আমেরিকার শাসনকালে ফিলিপিনে অনেক প্রগতি পরিলক্ষিত হয়। স্পেনীয় শাসনের তুলনায় তা ছিল অনেক উদার ও সহানুভূতিমূলক। দুটি প্রশাসন ব্যবস্থায় পার্থক্য ছিল। কারণ স্পেনীয়রা যে সময়ে ফিলিপিনে আবির্ভূত হয়েছিল তখন পশ্চিম ইউরোপে উদার নৈতিকতা বা গণতন্ত্র কোনটিই তেমনভাবে প্রসারলাভ করেনি অথচ বিংশ শতাব্দীতে আমেরিকা পরিচিত হল পৃথিবীর প্রথম গণতান্ত্রিক ও আধুনিক প্রগতিমূলক রাষ্ট্ররূপে। এই হিসাবে স্পেন অনেক পিছিয়ে ছিল তাই উপনিবেশগুলিতে কোন অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়নি। অন্যদিকে আমেরিকার শাসনে ফিলিপিন্সে অগ্রগতি দেখা গেল।

স্পেনীয় শিক্ষাব্যবস্থা ছিল ধর্মমূলক ও চার্চের নিয়ন্ত্রণাধীন। কোন ধর্মনিরপেক্ষ বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা দেওয়া হত না স্পেনীয় উপনিবেশগুলিতে। আমেরিকার প্রশাসনকালে শিক্ষাকে ধর্মব্যবস্থা থেকে পৃথক করা হল। যদিও স্পেনীয়রা ফিলিপিন্স দ্বীপে কলেজ স্থাপন করেছিল তা কিন্তু ধর্মভিত্তিক। আমেরিকা ধর্ম-নিরপেক্ষ শিক্ষা এখানে চালু করে। বহু শিক্ষক আমেরিকা থেকে আসতে থাকেন, ইংরেজী ভাষার ব্যাপক প্রসার হয়, নতুন শিক্ষাক্রম চালু হয়। স্বাস্থ্য, শরীর, পৌর শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। শেখানো হতে থাকে মানবিক মূল্যবোধ। ফলে ফিলিপিনের সমাজজীবনের সর্বক্ষেত্র থেকে স্পেনীয় প্রভাব নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। আমেরিকীয় শিক্ষাব্যবস্থায় ফিলিপিনোরা আধুনিক রাজনীতি সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করে। তাদের মনের প্রসারতা লাভ হয় এবং রাজনৈতিক সচেতনতা আসতে থাকে। দ্বীপবাসীরা রাজনীতির গণতান্ত্রিকরণে আগ্রহী হয়ে ওঠে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর দেখা গেল এক পরিবর্তিত চিত্র। সমাজব্যবস্থা এমনভাবে আমেরিকার আধুনিকতাকে গ্রহণ করেছিল যাতে ফিলিপিনের পোশাক, কথাবার্তা, আচরণ সবকিছু থেকে একটা বিষয় যেন স্পষ্ট হতে লাগল যে তারা ফিলিপিনো নয় তারা আমেরিকান। অর্থাৎ আমেরিকার প্রভাব জনজীবনের সর্বাঙ্গীন স্তরে পৌঁছে গিয়েছিল। ফিলিপিনে মৃত্যুহার কমে গিয়েছিল। জনগণ স্বাস্থ্য সচেতন হয়ে উঠেছিল।

অন্যদিকে আমেরিকাতেও ফিলিপিন সম্পর্কে নীতি নির্ধারণের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হতে থাকে। ১৯০২ সালে Organic Act পাস হয়। এই বছরই Cooper Act পাস করে বলা হয় যে ফিলিপিন যাতে ক্রমিক পর্যায়ে স্বাধীনতা লাভ করতে পারে তার জন্য আমেরিকা সাহায্য করবে। ১৯১৬ সালে Jones Act পাস করে পিলিপিন জীবনযাত্রার অনেক ক্ষেত্রে স্বাধীনতার প্রসার ঘটানো হয়। ১৯৩৪ সালে পাস হয় Tydings Meduffic Act। এই আইনে বলা হল স্বায়ত্তশাসনের দশ বছর কালের অধিকার শেষ হলে ফিলিপিনোরা স্বাধীনতা পাবে। ১৯৩৫ সালে তাদের নিয়ে গঠিত হয় ফিলিপিন কমনওয়েলথ। অবশেষে ১৯৪৬ সালে ফিলিপিন স্বাধীনতা লাভ করে।

৬৮.৭ ইন্দোচীনে ফরাসি অনুপ্রবেশ

ইন্দোচীনে ফরাসিরাই একমাত্র তাদের আধিপত্য বজায় রেখেছিল এবং অন্য কোন পশ্চিমী শক্তি যাতে এখানে প্রভাব বিস্তার করতে না পারে সে বিষয়েও সতর্ক ছিল। ব্রিটিশদের মতো তারাও একই উদ্দেশ্য পোষণ করত। ডাচ ও ব্রিটিশদের সঙ্গে বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হওয়া, নিজ প্রভাবাধীন অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করে নেওয়া। ইন্দোচীন রাষ্ট্র বলতে বোঝান হয় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয় উপমহাদেশের পূর্ব উপকূলবর্তী রাজ্যসমূহ নিয়ে গঠিত অঞ্চলকে। এই রাজ্যগুলির মধ্যে অন্নাম, টংকিন, লাওস ভিয়েতনাম ও কম্বোডিয়াকে বোঝায়। আপনারা আগেই জেনেছেন এখানে প্রথমে পর্তুগীজরা এসেছিল এবং ১৬১৫ সালে ফাইফো (Faifo) অঞ্চলে ঘাঁটি স্থাপন করেছিল। এই অঞ্চলটি ছিল আন্নাম ও টংকিনের মধ্যে সংযোগ রক্ষাকারী একটি অংশ। এখানকার উলেখ্য বাণিজ্যপণ্য ছিল কাঁচা রেশম। ফরাসিরা ইন্দোচীনে পর্তুগীজদের পরেই আসে কিন্তু এদের অনুপ্রবেশের গতি ছিল খুব ধীরে। ১৬৬৮-তে ভারতের পশ্চিম উপকূলের সুরাটে, ১৬৬৯ সালে জাভার বান্টমে এবং ১৬৭৪ সালে পূর্ব ভারতীয় পন্ডিচেরীতে ফরাসি প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা হয়ে গিয়েছিল। এই সময়কালের মধ্যেই অনেকবার ভিয়েতনামের হিউ ও তুরেনে ফরাসি কুঠি স্থাপনের প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। ইন্দোচীনের পাঁচটি রাজ্যে ফরাসি আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয় ১৭৪৭ সালে এবং তা ধীরে ধীরে শক্তিশালী হয়ে ওঠে ১৮৫৪ সালের মধ্যে ব্রিটিশদের মতো ফরাসিরাও কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করে এখানে নিজেদের কুঠি (Factory) প্রতিষ্ঠা করে। অবশ্যম্ভাবী ভাবে অন্যান্য পশ্চিমী শক্তির সঙ্গে সংঘর্ষে অবতীর্ণ হয়। সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে পশ্চিমী উপনিবেশিক অনুপ্রবেশের যুগে এই চিত্র অবধারিতভাবে উপস্থিত হয়েছে।

৬৮.৭.১ ফরাসি মিশনারীদের সক্রিয়তা

ফরাসি মিশনারীরা ১৬২৭ সালে টংকিনে প্রথম এসে উপস্থিত হন। এরপর ১৬৬৪ সালের মধ্যে আন্নাম, টংকিন অঞ্চলে ক্যাথলিন চার্চ, পাঠাগার প্রভৃতি নির্মিত হয়। ফরাসি মিশনারীগণ কখনো রাজাদের কাছ থেকে ভূখণ্ড লাভ করতেন। কম্বোডিয়া ও ভিয়েতনাম অঞ্চলে এইসব ভূখণ্ডে নির্মিত প্রতিষ্ঠানগুলি মিসনারী কর্মকাণ্ডের প্রধান কেন্দ্র হয়ে উঠতে থাকে। দেখা যেত এখানকার মিশনারীরাও রাজাদের মধ্যে ফরাসি সরকারে সঙ্গে কূটনৈতিক মিত্রতায় আবদ্ধ হবার জন্য সামান্য চাপ সৃষ্টিও করতেন। ভিয়েতনামী রাজারা কোন কোন সময়ে কূটনৈতিক মিশন প্রেরণ করেছেন ফ্রান্সে। এই মিশনারীরা রাজার দরবারে দো-ভাষীর কাজ করতেন। তাই দেখা যায় মিশনারীরা রাজনৈতিক ভূমিকাও পালন করেছিলেন। তবে ভিয়েতনামী বা ইন্দোচীনের জনগণ খুব সহজে মিশনারীদের মনে নেয়নি। শুধু মিশনারী নয় ফরাসি অনুপ্রবেশও খুব সহজে ইন্দোচীনের জনগণের কাছে স্বীকৃতি পায়নি। প্রতিরোধ সবসময়েই ছিল কিন্তু মিশ্র সমাজ ও সংস্কৃতির কারণে প্রতিরোধ কখনোই ঐক্যবদ্ধ রূপ নেয়নি। তাই দেখা যায় খুব অল্প সময়েই এখানে ফরাসি আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

৬৮.৭.২ ইন্দোচীনের রাজতন্ত্র ও ফরাসি সম্পর্ক

অষ্টাদশ শতকে ইন্দোচীনের হিউকে রাজধানী করে গিয়া ল্যাং-এর এঙ্গুয়েন রাজতন্ত্র (Nguyen Dynasty) স্থাপিত হয়। এই স্থাপনের ক্ষেত্রে ফরাসি রাজকর্মচারী, বণিকদের যথেষ্ট সহায়তা ছিল। রাজধানীর নির্মাণ, সড়ক, যাতায়াত ইত্যাদি ক্ষেত্রে ফরাসি ইঞ্জিনীয়ারদের অবদান ছিল গুরুত্বপূর্ণ আর এই কারণেই রাজতন্ত্র ফরাসিদের প্রতি খুবই মিত্রতাপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন। একই সঙ্গে খুব স্বাভাবিকভাবে ফরাসি ক্যাথলিক মিশনারীরা যথেষ্ট স্বাধীনতা লাভ করেছিলেন। আন্নাম, কোচিন-চীনেও ফরাসি বণিক ও মিশনারীরা খুবই সক্রিয় ছিলেন। গিয়া লং তাঁররাজদরবারের ফরাসি প্রতিনিধিদের উচ্চ সরকারিপদ 'মান্ডারিন' (Mandarin) খেতাব প্রদান করেন একই সঙ্গে কয়েকটি বিশেষ অধিকার এবং সুবিধাও দিয়েছিলেন।

প্রকৃতপক্ষে ফরাসিদের কাছে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় রাজকীয় উপনিবেশ স্থাপন করাই ছিল সর্বাপেক্ষা গৌরবজনক ও মর্যাদাপূর্ণ রাষ্ট্রীয় বিষয় এবং ব্যবসা-বাণিজ্য ছিল ফরাসিদের কাছে অপেক্ষাকৃত এক গৌণ ব্যাপার।

৬৮.৭.৩ গিয়া ল্যাং রাজতন্ত্র ও সমাজ সংস্কার

গিয়া ল্যাং চীনা রীতি অনুয়ায়ী কনফুসিও ধর্মের প্রবর্তন করেছিলেন একই সঙ্গে গৃহীত হয়েছিল নতুন আইন সংহিতা (Legal code)। নেপোলিয়ানের যুদ্ধ এবং ফ্রান্সের বুরবোঁ রাজতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠায় যুদ্ধের পর নতুন করে ফরাসি বাণিজ্যতরী ভিয়েতনামের বন্দরগুলিতে ভীড় জমাতে আরম্ভ করে। ১৮১৭ সাল থেকে ১৮২০ সাল পর্যন্ত ফরাসি-কনসাল (Chaignean) এখানে কূটনৈতিক ও বাণিজ্যিক কাজকর্ম পরিচালনা করেছিলেন।

৬৮.৭.৪ ইন্দোচীনের পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতি

১৮২০ সালে গিয়া ল্যাং-এর মৃত্যু রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পরিবর্তন নিয়ে আসে। নতুন রাজ্য মিং-মাং তাঁর রাজ্যে কনফুসিও ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম ও ক্যাথলিক ধর্মকে সম্মান প্রদর্শন করলেও কনফুসিওবাদ ও চীনা সংস্কৃতির অনুরাগী ছিলেন। কনফুসিও ধারায় রাষ্ট্র, সমাজ, সংস্কৃতি, প্রশাসন সর্বক্ষেত্রে পরিবর্তন শুরু হল। সনাতনপন্থী হবার ফলেই তিনি বিদেশীদের খুব একটা বিশ্বাস করতেন না। ব্রিটিশ, ফরাসি ও আমেরিকান কেউই তাঁর কাছে বিশ্বাসযোগ্য ছিলেন না। ইউরোপীয়রা তাঁর চোখে ছিলেন বর্বর।

ইউরোপীয় বণিকদের রাজনৈতিক চাপ তাঁকে অনেকখানি বিরোধী মনোভাবাপন্ন করে তুলেচিল। ১৮২৫ সালে তিনি রাজ্যে সমস্ত মিশনারীদের প্রবেশ বন্ধ করে দিলেন। এর প্রায় দশ বছরের মধ্যে রাজকীয় আদেশে সমস্ত প্রকার খ্রিস্টীয় প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করে ফেলার এবং খ্রিস্টধর্মে বিশ্বাসীদের প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়। বহু যাজক, মিশনারী প্রাণ হারান এর ফলে। ১৮৩৬ সালে ইউরোপীয় বাণিজ্য জাহাজের প্রবেশের পথ হিসাবে হিউ, হ্যানয়

বন্দরগুলিকে নিষিদ্ধ করা হয়। অবশ্য এখানে অতিরিক্ত কঠোরতর কারণ হিসাবে ১৮২৪-২৫ সালে ইঙ্গো-ব্রহ্ম যুদ্ধ ও দক্ষিণ বর্মার উপর ব্রিটিশ অধিকারকে উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করে বলা হয় ইউরোপীয় বণিকদের এই কর্মকাণ্ড ইন্দোচীনের রাজতন্ত্রে সন্দেহের সৃষ্টি করেছিল।

৬৮.৭.৫ ফরাসি আধিপত্য প্রসারণের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা

রাজতন্ত্রের কঠোরতা সত্ত্বেও ফরাসি মিশনারীরা প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে ভিয়েতনাম, কোচিন-চীনে প্রবেশ করতে থাকে। এই সময়ে বহু ফরাসি মিশনারীরা বন্দী অবস্থায় মৃত্যুর দিন গুণছিলেন ১৮৪৬ সালে ফরাসিদের দাবি তুরেন বন্দর দা নাঙ্গ (Da Nang) অবরোধ করে। প্রায় দুসপ্তাহ ধরে গোলাবর্ষণ চলতে থাকে ফরাসিদের দাবি ছিল ফরাসি ধর্মযাজক লেফেভের (lefevre) সহ আরো পাঁচজন মিশনারীর মুক্তি। এঁরা প্রাণদণ্ডের আদেশে ভিয়েতনামী কারাগারে বন্দী ছিলেন। ফরাসি রণকৌশল ও উন্নত অস্ত্রশস্ত্র ও সামরিক বাহিনীর কাছে রাজতন্ত্র হার মানতে বাধ্য হয় এবং ফরাসি মিশনারীরা মুক্তি পান।

৬৮.৮ ইন্দোচীন রাজতন্ত্রের বিরোধিতা

ইতিমধ্যে ১৮৪১ সালে মিং-মাং’ এর মৃত্যু হয়েছে তাঁর পুত্র থিউ-ট্রি (Thieu-Tri) রাজা হয়েছেন। থিউ-ট্রি ছিলেন পিতার থেকেও বেশি ইউরোপীয় বিরোধী মনোভাবাপন্ন। ইউরোপীয় রাজনীতিতেও এসেছিল পরিবর্তন। লুই নেপোলিয়ান মেক্সিকোর ব্যর্থতা কোচিন-চীনে পূরণ করে নিতে চাইলেন। ফরাসি ঔপনিবেশিকতাবাদ এই সময় উগ্ররূপ নিল। ১৮৪৬ সালে তুরেন (দা-নাঙ্গ) ফরাসি অধিকৃত হয়েছিল। যুদ্ধকালীন নৌঘাঁটি এবং শান্তির সময়ে বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবে দা-নাঙ্গ দ্বিবিধ উদ্দেশ্য পূরণ করতে পারবে। এই চিন্তাভাবনা করে ফ্রান্সেও এইসময় নৌ-মন্ত্রক, বিদেশী দপ্তর প্রভৃতি স্থাপন করে জাতীয় মর্যাদা বৃদ্ধি করার প্রয়াস দেখা যায়।

১৮৪৮ সালে থিউ-ট্রির স্থলাভিষিক্ত হলেন পুত্র তু-ডাক (Tu-Duc) তাঁর সময়ে ইউরোপীয় বিরোধিতা সন্দেহ মনোভাব, মিশনারী বন্দী এবং হত্যা ব্যাপকভাবে হতে থাকে। রাজদ্রোহিতার অপরাধে অনেক ফরাসি মিশনারী কারারুদ্ধ হলে পুনরায় তুরেনে ফরাসি নৌ-অবরোধ শুরু হয়। এই সময় ১৮৫৬ সালে শুধু ফরাসি নয় কিছু স্পেনীয় ধর্মযাজক প্রাণদণ্ডের আদেশ পেয়েছিলেন।

৬৮.৮.১ ইন্দোচীনের যুদ্ধ ও কোচিন চীনের অধিকার

ইউরোপে ১৮৫৬ সালে শুরু হয়েছিল ক্রিমিয়া যুদ্ধ। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ব্রিটিশ ও ফ্রান্সকে মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ করেছিল তাই প্রাচ্যে ভিয়েতনামের রাজতন্ত্রের কাছে ব্রিটিশ, ফ্রান্স ও ফিলিপিনের একত্র দাবি উপস্থিত

করে বলা হয় মিশনারীদের মুক্তি, খ্রিস্টধর্মের স্বাধীনতা দেওয়া, এবং হিউ অঞ্চলে ফরাসি কনসাল রাখতে রাজতন্ত্র স্বীকৃতি প্রদান করুন। এটা অবধারিতবাবে অনুপ্রবেশেরই একটা প্রয়াস ছিল। তবে রাজতন্ত্র কর্তৃক এই দাবি অস্বীকৃত হলে ভিয়েতনামের বিরুদ্ধে ১৮৫৮ সালে যুগ্মভাবে স্পেনীয় ও ফরাসি অভিযান শুরু হয়। তিনবছর যুদ্ধ চলার পর ১৮৬২ সালে রাজা তু-ডাক সন্ধি করতে বাধ্য হলেন। চুক্তি অনুযায়ী কোচিন চীন, সায়গন ফ্রান্সকে ছেড়ে দিলেন, রাষ্ট্রের সর্বত্র ফরাসি অনুপ্রবেশ স্বীকৃত হল, আন্নামে ফরাসি প্রটেকটরেট প্রতিষ্ঠা হল, আন্নামের তিনটি বন্দর ফরাসি বাণিজ্যের জন্য খুলে দেওয়া হল। রাজা যুদ্ধের ক্ষতিপূরণের জন্য ৪ মিলিয়ন অর্থ দশটি কিস্তিতে দেবেন বলে স্বীকার করেন। এছাড়া খ্রিস্টধর্ম ভিয়েতনামে স্বীকৃত হয় এবং ফরাসিরা মেকং নদীতে নৌ পরিচালনার অধিকার লাভ করে। ১৮৬৭ সালের মধ্যে ফরাসিরা কোচিন-চীনের বাকি অংশ ও মেকং নদীর অববাহিকা অঞ্চলে পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে।

৬৮.৮.২ কম্বোডিয়া দখল

কোচিন-চীনের পর ফরাসি আধিপত্য প্রতিষ্ঠার দ্বিতীয় ক্ষেত্র ছিল কম্বোডিয়া। দুটি শক্তিশালী রাষ্ট্রের (থাইল্যান্ড ও ভিয়েতনাম) মধ্যবর্তী অঞ্চলে কম্বোডিয়া ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে পড়ছিল। ১৮০২ সাল থেকে স্বরাষ্ট্র বিরোধ এড়ানোর জন্য কম্বোডিয়া দুটি রাষ্ট্রেই নজরানা পাঠাতে থাকে কিন্তু তার রাজনৈতিক তথা রাজতান্ত্রিক সঙ্কটের কারণে দুটি রাষ্ট্রই কম্বোডিয়ার প্রতি মনোযোগী হয়। রাজতন্ত্রের উত্তরাধিকারী দুটি পক্ষের মধ্যে একে অন্য পক্ষের বিরোধী দলে দুটি শক্তিশালী রাষ্ট্রের সমাবেশ হয়। কম্বোডিয়ার ভাবী রাজা ও তাঁর ভ্রাতার পক্ষে একদিকে থাইরাজ দ্বিতীয় রাম এবং অন্যদিকে ভিয়েতনামের রাজা মিন-মিং সমর্থন দিচ্ছিলেন। যেহেতু কম্বোডিয়া ছিল থাইল্যান্ডের ভ্যাসান অঞ্চল সেই কারণে দ্বিতীয় রাম রক্তপাতের পরিবর্তে কিছু অঞ্চল কম্বোডিয়ার কাছ থেকে নিয়ে নেন। এই অবস্থা চলতে থাকে ১৮৩৪ সাল পর্যন্ত। ১৮৩৪ সালে কম্বোডিয়ার রাজার মৃত্যুতে ভিয়েতনাম এই অঞ্চলকে কার্যত নিজ রাষ্ট্রভুক্ত করে নেয়। ১৮৪১ থেকে ১৮৫১ সাল পর্যন্ত সময় ছিল কম্বোডিয়ার স্বাধীনতা দুটি রাষ্ট্রের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল।

১৮৫২ সালে কম্বোডিয়ার রাজা ফরাসি সম্রাট লুই নেপোলিয়নকে পত্র মারফত তাঁর রাজ্যে হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করেন। ফ্রান্সও ভিয়েতনামের কোচিন-চীনের পর কম্বোডিয়াতে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে আগ্রহী ছিল। ১৮৬৩ সালে একটি চুক্তির দ্বারা এখানে ফরাসি প্রোটেকটরেট স্থাপিত হয়।

১৮৬৮ সালে উৎসাহী ফরাসী বণিকরা রেডরিভার নদীপথে চীনের সঙ্গে বাণিজ্যের রাস্তা আবিষ্কার করে ফেলে। টংকিন থেকে রেডরিভার হয়ে দক্ষিণ চীনে সিল্ক, চা, বস্ত্র প্রভৃতির ব্যবসা করার জন্য ফরাসিরা উদ্যোগী হতে থাকে। ইতিপূর্বে এখানকার বাণিজ্যপথগুলিতে বিশেষ করে টংকিন অঞ্চলের চীন-ভিয়েতনাম সীমান্ত এলাকায় কিছু চীনা উপজাতির (Yellow flag and Black flag) দুধর্ষ বাহিনী রেডরিভার নদীপথের অঞ্চলে লুঠতরাজ চালাত। অরাজকতা, লুঠপাট, অস্থিরতা এখানকার বৈশিষ্ট্য হয়ে ওঠে। উৎসাহী ফরাসী বণিকগোষ্ঠী এখানকার অঞ্চল থেকে

বেআইনীভাবে লবণ খনিজদ্রব্য ও আগ্নেয়াস্ত্র প্রভৃতির বাণিজ্যে আগ্রহী ছিলেন। ভিয়েতনামী বণিকরা এখানে ফরাসি আধিপত্য স্থাপনের বিরোধিতা শুরু করে। কিন্তু ফরাসিরা কৌশলে এখানে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। রেডরিভার নদীপথে বিদেশী বাণিজ্য স্বীকৃত হয়। ফরাসিদের জন্য টংকিনের তিনটি বন্দর উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। ১৮৮৩-৮৪ সালে ফরাসিরা চাপ সৃষ্টি করে হ্যানয় এবং হিউ অঞ্চলে ফরাসি রেসিডেন্ট রাখার অনুমতি আদায় করে নেয়। আন্নামের রাজতন্ত্রের পক্ষ থেকে চীন সম্রাটের সাহায্য প্রার্থনা করা হয় এবং ১৮৮৫ সালে ফ্রান্সের সঙ্গে চীনের সংঘর্ষ শুরু হয়। দুর্বল প্রতিপক্ষ চীন খুব সহজেই ফ্রান্সের কাছে পরাজিত হয়ে আন্নাম, টংকিনে ফরাসি অধিকার স্বীকার করে এবং দক্ষিণ চীনে ফরাসী বণিকদের বাণিজ্যিক অধিকার দান করে। এছাড়া ফরাসিরা রেডরিভার উপত্যকায় হানয় থেকে কুনমিং (Kunming) পর্যন্ত রেলপথ স্থাপনের অধিকার পায়।

১৮৮৫ সালের এই চুক্তিতে প্রায় কয়েক শতাব্দী ব্যাপী চীনের সঙ্গে ভিয়েতনামের যে অধীনতামূলক সম্পর্ক ছিল তা পরিবর্তিত হয়ে যায়। এরপর থেকে সমগ্র ভিয়েতনামে একচ্ছত্র ফরাসি অধিকার স্থাপিত হয়।

৬৮.৮.৩ লাওস অধিকার

ভিয়েতনামের একমাত্র স্বাধীন অবশিষ্ট অঞ্চলটি ছিল লাওস। এই অঞ্চলের উপর ফরাসিদের সজাগ দৃষ্টি অনেকদিন ধরে বিদ্যমান ছিল। মেকং নদীর উপত্যকা অঞ্চলেই ঘন সন্নিবিষ্ট ছিল লাওসবাসীরা। লাওসের অধিবাসীদের কাছে ভিয়েতনামের আধিপত্য পছন্দই ছিল না। পার্শ্ববর্তী শক্তিশালী রাষ্ট্র থাইল্যান্ডও লাওসের প্রতি মিত্রভাবাপন্ন ছিলেন। বস্তুতপক্ষে চতুর্দশ থেকে ষোড়শ পর্যন্ত লাওস ছিল ব্রহ্মদেশ, থাইল্যান্ড ও ভিয়েতনামের যুদ্ধ করার মুক্ত অঞ্চল। ঊনবিংশ শতকে চক্রী রাজতন্ত্রের সময়কালে লাওসের উপর শ্যামদেশ বা থাইল্যান্ডের আধিপত্য স্থাপিত হলে, ভিয়েতনাম তা মানতে অস্বীকার করে ফলে সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। এই থাই-ভিয়েতনামী সংঘর্ষে ক্ষতিগ্রস্ত হয় লাওসের রাজধানী লান জ্যাং (Lan Xang) এবং তা তিনটি অঞ্চলে বিভক্ত হয়ে যায়—ভিয়েনতিয়ান, লুয়াং প্রবাং এবং চম্পাসাক। শেষোক্ত অঞ্চল দুটিকে ১৮৩৬ সালে থাইরাজ তৃতীয় রাম শ্যামদেশভুক্ত করেন। ফলে লাওসবাসীরা প্রায় থাইল্যান্ডেরই অধীন হয়ে পড়ে।

ইতিমধ্যে ফরাসি অনুপ্রবেশ শুরু হয়ে গেছে। ভিয়েতনামে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ফরাসি প্রটেকটরেট। এই বিষয়টি চক্রীরাজ চুলালংকর্ণ খুব সুনজরে দেখেন নি এবং যাতে লাওসে থাই অধিকার আরো সুনির্দিষ্ট হয় তাই তিনি লুয়াং প্রবাং—এর উপর পূর্ব অঞ্চল হয়ে ব্ল্যাক রিভার উপত্যকা পর্যন্ত ১৮৮৫ সালের মধ্যে দখল করে নেন। ফরাসিরা এ ব্যাপারে চক্রী রাজের সঙ্গে ব্রিটিশ সমর্থন আশংকা করে। কারণ ইঙ্গো-ফরাসি দ্বন্দ্ব ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছিল এবং সমগ্র ব্রহ্মদেশে ব্রিটিশ অধিকার সম্পূর্ণ হয়েছিল।

৬৮.৮.৪ থাই-ফরাসি প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও ইন্দোচীনে ফরাসি অধিকার স্থাপন

ইতিমধ্যে থাইরাজতন্ত্রের নির্দেশে ফরাসি গভর্ণরকে ব্যাংককে বন্দী করে রাখা হয়। কারণ লুয়াং অঞ্চলে ফরাসি প্রভাব বৃদ্ধি পাচ্ছিল এবং চক্রীরাজ তা নিশ্চিহ্ন করতে চাইছিলেন। এরপর ফরাসিরা লুয়াং-এ থাই সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে নেয় পরিবর্তে এখানে একটি Vice-Consulate স্থাপনের অধিকার পায়। ফরাসি

কনসাল লাওসের জনতাকে বোঝাতে থাকেন ফরাসি প্রটেকটরেটের আওতাভুক্ত হলে তারা কিভাবে পশ্চিমী শক্তি দ্বারা উপকৃত হবে। ফলে জনগণের থাইল্যান্ডের বিরুদ্ধে যে অসন্তোষ ছিল তা পুঞ্জীভূত হয়ে ওঠে এবং ফরাসি কনসাল ১৮৯২ সালে রেসিডেন্ট রূপে ব্যাংককে উপস্থিত হলেন। ফরাসি নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল কি করে লাওসের উপর থেকে থাই নিয়ন্ত্রণ দূরীভূত করা যায় এবং ফরাসি কনসালও সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। ১৮৯৩ সালে দুজন ফরাসি প্রতিনিধিকে থাইল্যান্ড থেকে বিতাড়িত করা হলে ফরাসি সরকার পক্ষ থেকে ক্ষতিপূরণ দাবি করা হয় এবং ব্যাংককে রেসিডেন্ট (Auguste Pavie) মেকং নদীর বামপ্রান্ত সম্পূর্ণভাবে ফরাসীদের পক্ষে দাবী করে সেখান থেকে থাই সৈন্য অপসারণে থাই সরকারকে বাধ্য করেন। ১৮৯৩ সালে ফরাসি ও থাই সরকারের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তিতে মেকং নদীর বামপ্রান্ত ফরাসি অধিকার স্বীকৃত হয়।

ফ্রান্স ঔপনিবেশিকতাদের চরম রূপ এখানে প্রদর্শন করেছিল। ফ্রান্স ভিয়েতনামের রাজনীতিকে নিজপক্ষে নিয়ে এসে প্রয়োজনীয় অঞ্চলগুলিকে দখল করে ১৮৯৯ সালের মধ্যে লাওসের ওপর সম্পূর্ণ ফরাসি অধিকার স্থাপিত হয়। ১৮৯৯ সালের ফরাসি থাই চুক্তি ব্রিটিশদের অনুমোদনও লাভ করেছিল।

৬৮.৯ সারাংশ

এই এককটিতে আপনাদের কাছে আলোচিত হয়েছে ফিলিপিন দ্বীপপুঞ্জে স্পেনীয় উপনিবেশিক বিস্তার ও ইন্দোচীনে ফরাসি ঔপনিবেশিক অধিকার স্থাপনের প্রয়াস। দুটি ক্ষেত্রে অর্থাৎ দ্বীপ অঞ্চল ফিলিপিন্স ও মূল ভূখণ্ড অঞ্চল ইন্দোচীন যথাক্রমে স্পেনীয় ও ফরাসিরা খুব দৃঢ়তার ভিত্তিতে নিজ একাধিপত্য বজায় রেখেছিল।

ষোড়শ শতাব্দীতে স্পেনীয়রা যখন ফিলিপিন্স দ্বীপে আসে তখন এখানে কোন শক্তিশালী রাজতন্ত্র ছিল না। মানুষ ছিলেন গ্রামবাসী যে গ্রামকে বলা হত বারাঙ্গে এবং বারাঙ্গে অধিপতি দাতু নামে পরিচিত হতেন। এই শক্তিপূর্ণ গ্রামীণ জীবনে স্পেনীয়রা পদার্পণ করে প্রায় সাড়ে তিনশ বছর ঔপনিবেশিক শাসন পরিচালনা করলেন যে শাসনের প্রকৃতি ছিল কেন্দ্রীভূত স্বেচ্ছাচার। এই নিষ্ঠুর শাসনের বিরুদ্ধে ধীরে ধীরে জন-অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হয়ে ঊনবিংশ শতকের শেষভাগ থেকে বিদ্রোহ রূপে আত্মপ্রকাশ করতে থাকে। জোস রিজাল, আগুইনালডো প্রমুখ ছিলেন বিখ্যাত বিদ্রোহী নেতা। এরপর ১৮৯৮ সালে আমেরিকার কাছে স্পেন পরাজিত হলে, আমেরিকার সমর্থনে ফিলিপিনে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয়। কয়েক শতকের দাসত্বের পর ফিলিপিনবাসী গণতন্ত্রের স্বাদ পেল।

অন্যদিকে ফরাসিরা ইন্দোচীন বা ভিয়েতনামকে চীনের সঙ্গে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য একটা 'Spring Board' হিসাবে ব্যবহার করতে চেয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে ইন্দোচীনের ভৌগোলিক অবস্থান চীনের সঙ্গে প্রায় যুক্ত হবার ফলে ফরাসিদের মধ্যে একটি ধারণা হয়েছিল যে খুব সহজেই এই সম্পর্ক স্থাপন করা যেতে পারে। প্রথমদিকে ইন্দোচীনের রাজতন্ত্র ফরাসিদের প্রতি মিত্রতাভাবাপন্ন হলেও পরবর্তীকালে রাজতন্ত্র বিদেশীদের প্রতি বিরুদ্ধমনোভাব

পোষণ করতে থাকে কারণ তারা চীন বর্মার উপর বিদেশী অনুপ্রবেশের ফলাফল সম্পর্কে অবহিত ছিল। তবুও উন্নত রণকৌশল, প্রযুক্তির অভাবে ভিয়েতনাম নতি স্বীকারে বাধ্য হলেও একেবারেই সমগ্র ইন্দোচীনের উপর ফরাসি আধিপত্য প্রতিষ্ঠা পায়। তবে উৎসাহী ফরাসী বণিকরা নিরন্তর প্রয়াস চালাতে থাকে কিভাবে সমগ্র ইন্দোচীনে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে চীনের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপনের পথ উন্মুক্ত করা যায়। এই প্রয়াসে শেষ পর্যন্ত ফ্রান্স জয়ী হয়। আবিষ্কৃত হয় নতুন বণিজ্যপথ এবং কূটনৈতিক কৌশলে সমগ্র ইন্দোচীনে ফরাসি ঔপনিবেশিক অনুপ্রবেশ সম্পূর্ণ হয়।

৬৮.১০ অনুশীলনী

ক। বিষয়মুখী প্রশ্ন

১। ফিলিপিন দ্বীপের নামকরণ কিভাবে হয়?
২। এখানকার বাণিজ্যপণ্যগুলি কি?
৩। মুর কাদের বলা হত?
৪। দাতু কাদের বলা হত?
৫। ফিলিপিনের স্থানীয় রাজনৈতিক দলের নাম কি?
৬। ফিলিপিনের স্থানীয় ভাষা কি?
৭। এখানে বিশ্ববিদ্যালয় কবে স্থাপিত হয়?
৮। ইন্দোচীন রাষ্ট্র বলতে কি বোঝেন?
৯। এখানে প্রথম ঘাঁটি কে কোথায় স্থাপন করেন?
১০। 'মান্ডারিন' কি?

খ। সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্ন

১। কীরূপ আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে স্পেনীয় আধিপত্যের সূচনা হয়?
২। ম্যানিলা কী কারণে মুখ্য বাণিজকেন্দ্রে পরিণত হয়?
৩। টংকিন ও আন্নামে ফরাসি অধিকার কীভাবে স্থাপিত হয় তার একটি চিত্র প্রস্তুত করুন।
৪। ইন্দোচীনে ফরাসি আধিপত্য স্থাপনের মূলে কারণগুলি বর্ণনা করুন।

গ। দীর্ঘ উত্তরের প্রশ্ন

১। ফিলিপিন দ্বীপপুঞ্জে স্পেনীয় বাণিজ্যের ও প্রশাসনিক সংহতিকরণের একটি চিত্র প্রস্তুত করুন।
২। ইন্দোচীনের রাজতন্ত্রের সঙ্গে ফরাসি সম্পর্কের ধারাবাহিক বিবরণ দিন।
৩। ইন্দোচীনে ফরাসি মিশনারীর কার্যকলাপের প্রকৃতি কীরূপ ছিল?
৪। স্পেনীয় মিশনারীরা ফিলিপিন্সে কি কি কাজ করেছিলেন তার ফল কী হয়েছিল?
৫। ফিলিপিনে স্পেনীয় প্রশাসনের ফলাফল কী হয়েছিল?

৬৮.১১ গ্রন্থপঞ্জী

1. History and Culture of South-East Asia by Kailash. K. Beri, Starling Publishers 1994.
2. South-East Asia—A History by Lea E. Williams, O.U.P. 1976.
3. Modern Asia by M. N. Venkata Ramanappa, Vikas Publishing, 1979.
4. J.F. Cady—South-East Asia—Its Historical development Megrow Hill 1979.
5. South-East Asia—An Introductory History by Milton Osborne, George Allen and Unwin 1979.
6. The History of South-East, South and East Asia—Essays and Documents ed. by Khoo kay Kim, O.U.P. 1977.
7. Thailand in the Nineteenth Century by Hong Lysa Institute of South Asian Studies 1994.
8. The making of South-East Asia—Translated by H.M. Wright (By G. CEEDES) Routledge and Kegan Paul 1970.
9. D.R. Sardesai—South-East Asia—past and Present, Vikas Publishing 198.
10. J.F. Cady—A History of Modern Burma, Cornele University Press.